উপন্যাস-মালা।

(ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক চিত্রাবলী।)

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০২ সাল।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

উপন্যাস-মালা।
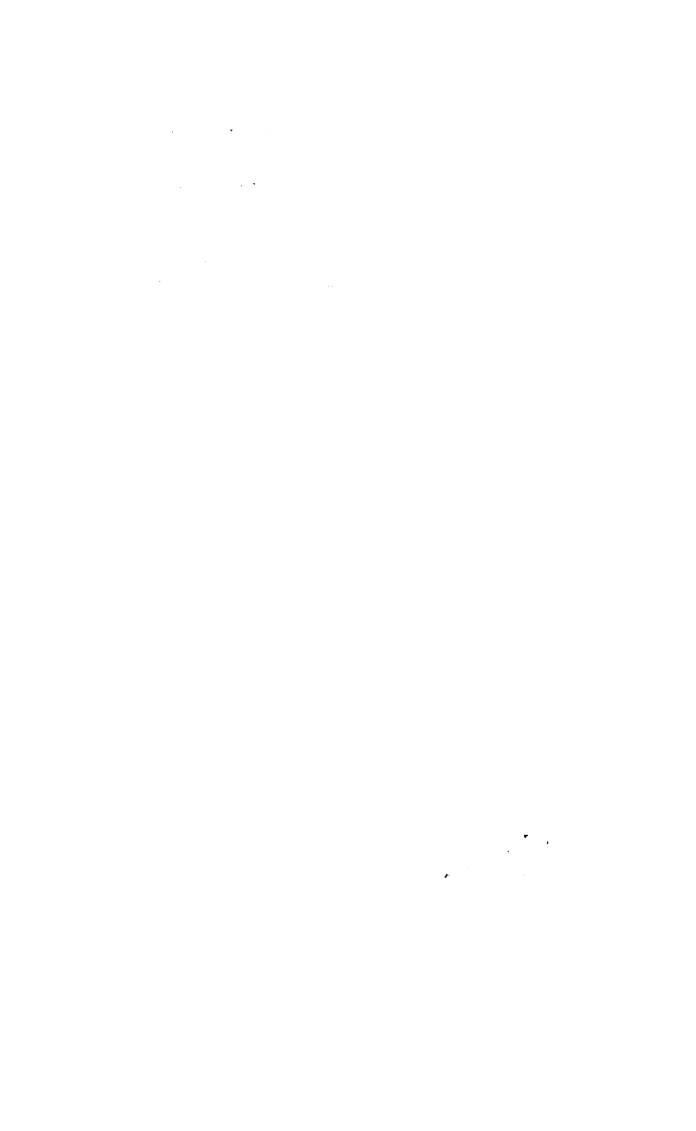
স্ত্রী।

স্ত্রীর নাম করিলে বাঙ্গালী যুবকের মন ভুলিয়া পড়ে, প্রাণটা যেন সুগন্ধময় বসন্তপবনস্পর্শে নৃত্য করে, সমুদয় আত্ম-প্রকৃতিতে যেন কি একটা জ্যোৎস্নার স্রোত ছুটিতে থাকে। নব-বিবাহিতের কাণের কাছে গুন্ গুন্ স্বরে স্ত্রীর নাম কর, সে ছাত্র হইলে পড়ার পুঁথি বন্ধ করিয়া, কেরাণী হইলে লেখনীর গতি স্থগিত রাখিয়া, অন্য মনে পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে কি যেন এক স্বপ্নের—ফুলের—সৌরভের—চাঁদের—জ্যোৎস্নার দেশে প্রবেশ করিয়া, অজ্ঞাতে দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবে, বা, একটা গভীর ঘনদীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িবে, অথবা এমন একটু সরস-স্ফূর্ত্তিমাখান হাসি হাসিবে—তাহা যেন তাহার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার ঘরে কচি গৃহিণীটীকে নব-যৌবন তুলি লইয়া শোভার নানা রঙে রঞ্জিত করিতেছে; অধরের হাসিতে, চ'খের জ্যোতিতে, চলনের ভঙ্গিমাতে, লজ্জার শেড্ দিতেছে; এবং হঠাৎ কোন লজ্জার ব্যাঘাত হইলে—কেহ মুখখানি দেখিতে পাইলে বা কথাটী উচ্চস্বরে শুনিতে পাইলে তাহার শান্তির জন্য মৃদুহাসি-

সঞ্চালিত জিহ্বাটীকে মুক্তাদন্তের একটু সামান্য আঘাতে কাটিতে উপদেশ দিতেছে; স্বামী কোন অপ্রিয় কথার আঁচ দেখাইলে, পাশ ফিরিয়া বসিয়া বা শুইয়া পায়ে ধরাইয়া, "দেহি পদপল্লব-মুদারম্" এই প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করাইতে শিক্ষা দিতেছে; দূরস্থ স্বামীর নামোল্লেখ করিয়া, সহচরীদিগকে পরিহাস করিতে দেখিলে, একটু দূর হইতে ক্ষুদ্র মৃণালহস্তের পদ্মমুষ্টিতে কিল্ উঁচাইয়া, শাসন-প্রকোপ প্রদর্শনের অন্তরালে আহ্লাদে আটখানা হইতে উপদেশ দিতেছে;—এরূপ কিশোরী প্রণয়িনীর স্বর্গনিংড়ান নাম, রূপ, ধ্যান ও আলাপ, যুবার জীবনে যে কিরূপ উপভোগ—তৃপ্তি—ও আত্ম-বিস্মৃতি,—তাহা যাহার আছে সেই জানে। আর যাহার নাই,—কিন্তু কোকিলের স্বরে, পাপিয়ার শব্দতরঙ্গে, বসন্ত—বাতাসের প্রতি হিল্লোলে 'একদিন পাইব' এই আশার সংবাদে জীবিত আছে—প্রাণপণে অধ্যয়ন করিতেছে—খাটিতেছে—মনে কত সুখের ঘর কল্পনা-ক্ষেত্রে বাঁধিতেছে—হৃদয়পটে সেক্ষপীয়র কালিদাসকে মাহিনা দিয়া আনাইয়া শকুন্তলা ডেস্‌ডিমোনার চিত্র আঁকাইতেছে; এরূপ নবগুম্ফিত নবীন যুবার নিকটে 'স্ত্রীর' নাম দূরস্থিত ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি।

কেবল বাঙ্গালী স্ত্রীর নামে গলে না; মানুষ মাত্রেই ও নামে রসে—পাকে—মজে। স্ত্রী, পুরুষের কঠোর জীবনের কোমল কবিতা; জীবনপর্ব্বতে প্রবাহিতা সুস্বাদসলিলা সুনির্ম্মলা স্রোতস্বতী;—তাহাতে দিবসের সূর্য্যবিদ্ধ আকাশ ও রজনীর চন্দ্রতারকাবিভূষিত নভোমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হয়। পুরুষ-জীবনের আকাশ সূর্য্য চন্দ্র তারা সব স্ত্রীর হৃদয়ে প্রণয়ে আদরে

সেবায় পরিলক্ষিত হয়। পুরুষের যাহা কিছু প্রকৃত তেজ, আশা সৌন্দর্য্য, সব স্ত্রীর স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত থাকে। যে স্ত্রীতে স্বচ্ছতা নাই, সে স্ত্রী নহে—রাক্ষসী। যে স্ত্রীতে স্বচ্ছতা আছে; স্বামীর কাছে দর্পণের ন্যায় কার্য্য করে, সেই প্রকৃত স্ত্রী—সতী স্ত্রী। যে সৌভাগ্যবশতঃ সতী স্ত্রী পাইয়াছে, সে দুঃখের অশ্রু-জলসিক্ত উর্ব্বরক্ষেত্রে সুখের বীজ বপন করিয়াছে। সে মৃত হইলেও জীবিত। ঘোরপাপিষ্ঠ হইলেও স্বর্গাধিপতি। সতী-স্ত্রী-সুখ-সম্ভোগের একটী চিত্র নিম্নে প্রদান করিলাম, পাঠকগণ! নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিবেন:—

শরৎ বাবু বড় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। চিন্তায় সর্ব্বদা দর্শন বিজ্ঞান ফুটিতেছে। এত বৈজ্ঞানিক চিন্তার এক পার্শ্বে সাংসারিক ভাবের একটু স্থান আছে। ভাবুক লোকেরা সংসার ক্ষেত্রে বড় দুঃখ পায়—হাট্ বাজারে ঠকে, দেনা পাওনায় লোকের নিকট বঞ্চিত হয়, পনর পয়সার কাচের গ্লাসটীকে পাঁচ টাকার ভাবিয়া বসে। শরৎ সে প্রকৃতির নহে। দেখিলে লোকটীকে নিরস বোধ হইতে পারে—গাম্ভীর্য্যের ঘন আবরণের জন্য; কিন্তু যে কিছু অধিক মিশিয়াছে, সে বুঝিয়াছে, লোকটীর ভিতরে ভিতরে রসের ফল্গুনদী খরধারে ছুটিতেছে। গম্ভীর প্রকৃতি ভেদ করিয়া যখন মৃদু হাসিটুকু বর্ষাকালের মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের মত অধরের গায়, চ'খের কোণে ফুটিয়া উঠে, তখন তার মুখের আভা দেখিলে চঞ্চল লোকের মন স্থির হয়—কর্ত্তব্য কাজে আস্থা জন্মে এবং ভাবুকের হৃদয়ে কবিতার পশ্লা, রৌদ্র মাখান বৃষ্টির পশলার মত ছড়াইয়া পড়ে।

শরতের চিরকালটা গরিব আনা চাল। পায়ে চটী জুতো,

তা বিবাহের সভাই বা কি, টাউন হলের বিরাট সভাই বা কি, আর আপনার খোড়ো চণ্ডীমণ্ডপেই বা কি, সর্ব্বস্থলেই শরতের পায়ে, ঠন্‌ঠনের চৌদ্দ আনা, কি, পনর আনাদামের চটী জুতা,—ধুলায় কাদায় সেই চটী জুতা। একখানা ধুতী ও মলমলের উড়াণী পরিধান করিয়া, হয় তো একটী পুরাণ ছাতা মাথায় দিয়া, শরৎ গ্রামে, সহরে, স্বদেশে, বিদেশে, গ্রীষ্মের তাপে পুড়িয়া, বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ঘরের, পরের, কত কাজ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও যাইতে হইলে সখের জিনিসের মধ্যে একগাছি বাঘমুখো বাঁশের লাঠি;—এটী শরতের পিতা ও পিতামহ ব্যবহার করিয়াছিলেন—তেলে ও হাতের ঘর্ষণে লাঠিটী এমনি পালিশ হইয়াছিল যে, দেখিলে অনেকের লাঠিটী লইতে ইচ্ছা হইত। শরতের পিতা কখন তামাক খাইতেন না, কিন্তু শামুকের খোলে নস্য ব্যবহার করিতেন—শরৎ তাহা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিত না। খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা শরতের ছিল না। রোহিৎ মৎস্যের ঝোল দিয়া ভাত খাইতে যেরূপ আনন্দ হইত, আর, শুধু নুন জল ও একখানা লেবুর রস দিয়া একটী মাত্র আলু ভাতের সহিত ভাত খাইতেও শরতের তদ্রূপ আনন্দ হইত। ঘরে শিকার হাঁড়িতে সন্দেশ গজা থাকিত, কিন্তু মুড়ি কড়াইভাজা খাইতে শরতের বড় রুচি ছিল। বাটীতে কাহারও ছেলে আসিলে নিজে শিকার হাঁড়ি হইতে সন্দেশ গজা জিলিপি লইয়া তাহাকে খাইতে দিত, দুই একখানা বা ঘরে লইয়া যাইতে বলিত। পাড়া গাঁয়ে বাড়ি, কাহারও ঘরে কুটুম্ব আসিয়াছে জানিতে পারিলে, ঘরে মিষ্ট দ্রব্য ফল মূল যাহা কিছু থাকিত, নিজে চাদর বা গামছা ঢাকা দিয়া, শরৎ

দিয়া আসিত। পুকুরে মাছ ধরান হইলে, সেখানে যতগুলি ছেলে মেয়ে থাকিত, সকলকে কিছু কিছু না দিয়া মাছ ঘরে আনিত না। বাগানের আম পাড়ান হইলে ভাল গাছপাকা টুক্‌টুকে আমগুলি আলাদা জমা করিত, পরে গ্রামের ঘর গণনা করিয়া সকলের বাড়িতে কিছু কিছু পাঠাইয়া দিত।

শরৎকে সকলেই সুখ্যাতি করিত। গ্রামের বুড়ার দলে শরতের বড় সুখ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল—তাহারা শরতের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিত। যুবারা শরতকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। শরৎ যুবা হইলেও যুবার দলে বড় মিশিত না। তার বন্ধু বান্ধব সব বৃদ্ধের দলে। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই শরতের বিজ্ঞতার সংযোগ হইয়াছিল। শরৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতি রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। নিজ যত্নে ইংরাজী শিখিয়াছিল, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়াছিল। বিদ্যার সহিত উপযুক্ত সচ্চরিত্রতার সংযোগ হওয়ায় শরৎ গ্রামটীকে জয় করিয়া বসিয়াছিল। সকল বিষয়ে শরৎ সর্ব্বেসর্ব্বা পরামর্শদাতা—কর্ত্তা। কাহারও বাটীতে বিবাহ, শরৎ সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, গৃহস্বামীকে আয়োজনের পরামর্শ দিতেছে। কাহারও বাটীতে শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ—পূজার বন্দোবস্ত সব শরতের সহিত পরামর্শ করিয়া হইতেছে। শরতের সচ্চরিত্রতা ও বিজ্ঞতার কথা গ্রামের সকলেই মাঝে মাঝে কহিয়া থাকে। সচ্চরিত্রতার একটী দীপ্তি শরতে খেলিত—যাহাকে কোন উপদেশ দিত, তাহা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিত—তাহার বিশেষ উপকার হইত। গ্রামে ২।১ জন যে কুলটা ছিল, তাহারা অন্যান্য যুবা দেখিলে

কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত; কিন্তু শরৎকে একটু দূরে দেখিতে পাইলে বা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলে, মুখ হেঁট করিয়া সরিয়া যাইত। শরৎ সে সব কিছু দেখিত না, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিত না। তার সেই যে কেমন গম্ভীর ভাবের দৃষ্টি, চলিবার সময় পায়ের সম্মুখের কিয়দংশ ভূমিতেই বদ্ধ থাকিত।

বাল্যকালেই শরৎ পিতৃমাতৃহীন হয়। বাটীতে এক বিধবা ভগিনী ছিল, সেই শরতের অভিভাবিকা। শরতের বয়স ২৮ বৎসর হইল, তখনও বিবাহ হয় নাই। বিবাহে শরতের ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ বড় ভগিনীর মৃত্যু হইল। শরতের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য বিজ্ঞতা ভেদ করিয়া শোক শরৎকে কিছুদিনের জন্য কাতর করিয়াছিল। সেই সময়ে গ্রামের অনেকে সর্ব্বদাই শরতের নিকট থাকিত। কেবল রাত্রিতে শরৎকে একলা থাকিতে হইত। গ্রামস্থ আত্মীয়গণ, শরৎকে বিবাহ করিবার জন্য খুব জোরের সহিত পরামর্শ দিতে লাগিল। শোকের বেগ অপনীত হইলে, শরৎও ভাবিয়া দেখিল, বিবাহ না করিলে বাটী ঘর সব উৎসন্ন যাইবে, বাগান পুকুর, পিতৃপিতামহের নাম সব বৃথা হইবে; অতএব বিবাহ করাই যুক্তিসঙ্গত। শরৎ বিবাহ করিবে এই কথা শুনিয়া সকলের আনন্দ হইল। বিবাহের ঘটক ঘটকী আনাগোনা করিতে লাগিল।

আঁটপুরের বৈদ্যনাথ ঘোষালের মেয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। বৈদ্যনাথের স্ত্রী ও একটী মেয়ে ও ৫০,০০০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল। শরৎ সুশীলা নামে এক তের বৎসরের স্ত্রী, স্নেহময় শ্বশুর, স্নেহময়ী শাশুড়ী পাইল

পঞ্চাশ হাজার টাকার কাগজ ও অন্যান্য কিছু ভূসম্পত্তির ভাবী অধিকারী হইল। বিবাহের পর, স্ত্রীর সহিত আলাপে, আলিঙ্গনে, চুম্বনে, শরৎচরিত্রে একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল :—সেই ভিতরের ফল্গুতে বন্যা আসিয়াছিল ;—অভ্যন্তরের রসটুকু বাহিরে ফুটিয়াছিল, হাসিতে একটু মধুরতা বাড়িয়াছিল। আর কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, বেশভূষা আহারাদি পূর্ব্বের মত রহিল।

শরতের স্ত্রী সুশীলা, রূপে লক্ষ্মী, গুণে স্বরস্বতী। সুশীলা রূপে জ্যোৎস্নাময়ী, কেশে আধারময়ী, হাস্যে বিদ্যুৎময়ী। উপরে সুকৃষ্ণ কেশদাম—নিম্নে ললিত-লাবণ্য-মাধুর্য্যময়ী দেহ, যেন আঁধারতলে আলোকরাশি ঝুলিতেছে। বাহিরের সৌন্দর্য্য, ভিতরের প্রণয়-স্নেহ মমতার কোমল আঘাতে দিন দিন সুগঠিত হইতেছে। হৃদয়নিঃসৃত সরল সরমের হাসি, ওষ্ঠের রক্তিমায় প্রাণের হিল্লোল দেখাইয়া, স্বামীর মৃত প্রাণকে সজীব রাখিবার জন্য সর্ব্বদা নীরবে সঞ্চরণ করিতেছে।

শরতের ঘরে সেই প্রেমমূর্ত্তি দিন দিন শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। শরতের হৃদয় প্রাণ অস্থি মজ্জায় সেই রূপ, সেই গুণ, সেই হাসি, সেই প্রণয়-কম্পিত আলিঙ্গন শৈলাঙ্গে সেহলার মত জড়াইতে থাকিল।

হাসিটুকু সুশীলার গোলাপী ঠোঁটে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। সুশীলার সমুদায় প্রকৃতি আনন্দে আর্দ্র ও সৌরভময়।

সুশীলার গন্ধে ঝগড়া বিবাদ টিকিতে পারেন না। সুশীলা অনেক সময়ে কৃত্রিম ঝগড়া গড়িতে যায় ;—কিন্তু হাসির তোড়ে কৃত্রিমতা ভাসিয়া যায়, সরলতা ফুটিয়া পড়ে ;—এবং সেই কৃত্রিম

ঝগড়ায় শরৎ খাঁটী প্রেমটুকুর এমন একটু সৌন্দর্য্য দেখে, যাহা, মেঘের আড়ালে চন্দ্রকরে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শরৎ যতক্ষণ ঘরের ভিতরে থাকে, ততক্ষণ সুশীলা ছাড়া থাকে না। শরৎ শুইয়া থাকিলে দিবসে সুশীলা পদতলে বসিয়া পদসেবা করে। শরৎ যখন মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কাজ কর্ম্ম করে, সুশীলা ঘরের কবাটের ধারে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে স্বামীর কার্য্যকলাপ দর্শন করে; কিন্তু যখন স্বামী স্নান করিয়া রান্নাঘরের মেজেতে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, আহার করিতে বসে, আর সুশীলা অন্ন ব্যঞ্জনে স্বামীকে পরিতুষ্ট করিতে থাকে, সেই সময়ের সুখ অপেক্ষা সুশীলা আর কিছু অধিকতর সুখ জানে না। স্বামীর খাইতে একটু ক্লেশের আঁচ বুঝিতে পারিলে, সুশীলা দারুণ যাতনায় কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিয়া স্বামীর সেই ক্লেশ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সে দিন আর সুশীলার খাইয়া বসিয়া সুখ হয় না।

শরৎ সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকিত না। ২।৩ মাস অন্তর কলিকাতায় যাইতে হইত। শরতের কলিকাতা যাওয়া সুশীলার পক্ষে বিষম বিপদ। যাইবার ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই সুশীলা কাঁদিতে আরম্ভ করিত। কখন শরতের গলা ধরিয়া বুকে চন্দ্রমুখখানি গুজিয়া উত্তপ্ত অশ্রু মোচন করিত, কখন স্বামীর আলিঙ্গনস্বর্গকে অশ্রুজলে প্লাবিত করিয়া, স্বামীর অস্তিত্বকে প্রেমের অতলতলে ডুবাইয়া দিত, এবং স্বামীর অশ্রুসিক্ত চুম্বনরাশির প্রণয়ভরে অভিভূতা হইত। বিদেশে যাত্রা করিবার দিন সুশীলার মন একটু স্থিরভাব ধারণ করিত। শরৎ যখন কাপড়, চাদর, পরিয়া হাতে ব্যাগটী লইত, তখন সুশীলার চক্ষে

দুই এক ফোঁটা জল ঝরিত বটে; কিন্তু শরতের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃষ্টিতে সুশীলার প্রাণ সবল হইত। কেবলমাত্র সুশীলার দেহখানি শরতের বুকের উপর হেলিলে, শরৎ দুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া 'আবার শীঘ্র আসিব,' বলিয়া একটু মৃদুহাসি হাসিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, সুশীলার মিষ্ট অধরযুগল হইতে দুই একটী অমৃতপূর্ণ চুম্বন আদায় করিয়া লোমাঞ্চিত হইত।

মৃদুমন্দ সুললিত হাসিটুকু যেমন সুশীলা সুন্দরীর অমূল্য স্বর্গীয় অলঙ্কার, পার্ব্বতীয় অরণ্যের ঈষৎ জ্যোৎস্নাজড়িত গাম্ভীর্য্যটুকু তেমনি শরৎপ্রকৃতির অতুলনীয় সামগ্রী। শরৎ অধিক হাসিতে, শব্দ করিয়া হাসির রোল তুলিতে পারে না। কোন কথার আঘাতে অন্যান্য বন্ধুরা যখন হাসির ঝড়ে উড়িতে থাকে, শরৎ তখন একটুমাত্র মুচকিয়া হাসে। সুশীলা শরৎকে উচ্চ হাসি হাসাইবার জন্য কত প্রয়াস পায়। কখন লাবণ্যময় হাতখানি লইয়া স্বামীকে 'কাতুকুতু' দেয়; কখন হঠাৎ একটি ভাঙ্গা ধুচুনি আনিয়া শরতের মাথায় দিয়া, "বর আমি তোমার ক'নে" বলিয়া রহস্য করে; কখন কৃত্রিম অভিমানে 'কৃষ্ণ হে রাধার মান ভঞ্জন কর' বলিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়ে। স্বামী স্ত্রীর এই সব লীলা দর্শনে প্রাণের আনন্দ প্রাণে চাপিয়া, কেবলমাত্র স্ত্রীর সুখ বৃদ্ধির জন্য এবং ভাবে আরও মাতাইবার নিমিত্ত, পর্ব্বতগুহানিপতিত জ্যোৎস্নাকণাটুকুর মত আপনার হৃদয়ের খাঁটি হাসিটুকু নাড়িতে নাড়িতে সস্নেহে স্ত্রীকে বক্ষে ধরিয়া, দুই একটী চুম্বন সুশীলার মুখ-জ্যোতিতে মিশাইয়া দিয়া সপ্তম স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

বিবাহের ৩ বৎসর পরে শরতের শ্বশুর পরলোকে গমন

করিলেন। ৪ বৎসর পরে শাশুড়িটীও মরিয়া গেলেন। শ্বশুরের যাবতীয় বিষয় শরতের অধিকারে আসিল। পিতৃমাতৃবিহীনা হইয়া সুশীলা কিছুকাল মনোকষ্টে ভুবিয়াছিল; কিন্তু স্বামীর স্নেহগুণে সে সব কষ্ট অচিরেই দূরীভূত হইল।

শ্বশুরের টাকা পাইয়া শরৎ কলিকাতায় একটী কাপড়ের দোকান খুলিল। ৪।৫ বৎসরের মধ্যে দোকানটীতে অধিক টাকা লাভ হওয়ায়, আর একখানা চাউলের দোকান খুলিল; কিন্তু এইখানেই শরতের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। দুখানা দোকানের কার্য্যে শরৎ অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; একটু বিশ্রাম করিবার সময় থাকিল না। এমন সময়ে সুশীলা সুন্দরীর ভয়ানক প্লীহা যকৃৎ উপস্থিত হইল। সে রূপজ্যোতি দিন দিন মলিন হইতে লাগিল। অনেক চিকিৎসায় বিশেষ উপকার না হওয়ায়, পরিশেষে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য চিকিৎসকদিগের পরামর্শানুসারে মুঙ্গের যাওয়া স্থিরীকৃত হইল।

শরৎ, স্ত্রী সুশীলা ও একটী আত্মীয়া স্ত্রীলোক এবং একটী হিন্দুস্থানী চাকর সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল। সুশীলার শারীরিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে শরতের স্ত্রী ছাড়িয়া ব্যবসা দেখা অসম্ভব। শরৎকে সর্ব্বদা মুঙ্গেরে স্ত্রীর নিকট থাকিতে হইত। এই রোগের সময় সুশীলা স্বামীর প্রণয়রস যে কি মধুর ও পবিত্র, তাহা সর্ব্বদা অনুভব করিতে করিতে এক এক সময়ে কাঁদিত। সুশীলার কিছুমাত্র ক্লেশ না হয়, এজন্য শরৎ প্রাণপণে চেষ্টা করিত। স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া কত গল্প বলিত, কত যুদ্ধের কথা, রাজা রাণীর চরিত্রের কথা, ধর্ম্মতত্ত্বের মিষ্ট

মিষ্ট কথা, শুনাইয়া স্ত্রীকে অন্যমনস্কা রাখিত। একদিন স্বামী স্ত্রীর মুখ খানি মৃদুস্পর্শে ধরিয়া জিজ্ঞাসিল 'সুশীলা! এই ব্যারামে তোমার কিছু ভাল লাগে না, নয়?' জিজ্ঞাসা করিয়াই স্বামী কাঁদ কাঁদ হইল। স্ত্রী হাসিয়া বলিল 'না— আমার ব্যারামে তোমার যত মিষ্ট লাগিতেছে, সুস্থ অবস্থায় তত মিষ্ট লাগে নাই। এখন আমার এক এক সময় তোমার কাছে বসিয়া, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া, তোমার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হয়, এতো বেশ আছি,—ব্যারামে কষ্ট আমার আর কিসের। এই কথাগুলি বলিয়া আবার সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ হেঁট করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার জন্য তোমার মনের কষ্টের কথা যখন মনে হয়, তখন আর আমি আমাতে থাকি না।"

সুশীলার ব্যারামে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে শরতের কলিকাতার ব্যবসা মাটি হইতে থাকিল। হিসাব পত্রের গোলমাল ও কর্ম্মচারিদিগের চৌর্য্য-বৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ ৫০ হাজার টাকার ব্যবসাটী মাটী হইল। ব্যবসাটী বজায় রাখিবার জন্য একদিন শরৎকে কলি-কাতায় আসিতে হইল। প্রথমতঃ কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাপড় চোপড় দোকানে যাহা আছে, তাহা অতি অল্প; ২৫ হাজার টাকার সামগ্রীর স্থলে ২।৩ শত টাকার সামগ্রী। কর্ম্মচারী হিসাবের খাতা দেখাইল। ধারে যাহারা জিনিষ লইত, তাহারা পলাতক। আর বলিল, আপনি ছিলেন না, কাপড় অনেক উইএ মাটী করিয়াছে। শরতের মাথায় বাজ পড়িল। চাউলের দোকানে গিয়া দেখিল, তাহারও অবস্থা

শোচনীয়। একজন মুহুরী আছে মাত্র, প্রধান কর্ম্মচারী পলাইয়াছে।

শরৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' আমার দুর্বুদ্ধিবশতঃ এই বিষময় ফল ফলিয়াছে; এজন্য আর আক্ষেপ করা বৃথা। এ বিপদকে গ্রাহ্য করি না, যদি আমার সুশীলা ভাল হয়। হায়! সুশীলা, কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিছুই জানে না। হায়! একে রোগযন্ত্রণায় অধীরা, এ দারুণ সংবাদ তাহাকে কোন্ মুখে কোন্ প্রাণে বলিব। একথা শুনিলে আর সে বাঁচিবে না। হায় ভগবান্! আমার গুণের স্ত্রী সুশীলা যদি বাঁচে তো আমি গাছতলায় গিয়া সুখী হইব, আমার সুশীলাকে প্রাণে মারিও না।

কর্ম্মচারীদিগের দোষে শরতের কেবলমাত্র যে পুঁজির টাকা নষ্ট হইয়াছিল, তাহা নহে;—শরৎ ৪।৫ দিন কলিকাতায় থাকিয়াই বুঝিতে পারিল, ৬।৭ হাজার টাকা দেনা হইয়াছে। দুই দোকানের জিনিষপত্র বিক্রয় করিলে ৪।৫ শত টাকার অধিক হইবে না। এই বিপাকে শরৎ ভাবিয়া দেখিল, শ্বশুরের বাড়ী, নিজ বাড়ী ও ভূসম্পত্তি সমুদয় বিক্রয় করিলে ৬।৭ হাজার টাকা হইতে পারে।

শরৎ মনকে স্থির করিল। ভাবিল, "মানুষের দশ দশা। ভগবান্ যখন যে দশায় ফেলেন, ভালর জন্য। বিষয় সম্পত্তি সমুদয় গেল, কোন ভাবিবার কারণ নাই; এখন সুশীলা যদি বাঁচে।" এই বিপাকে সুশীলার পীড়ার চিন্তাই শরৎকে ক্লেশ দিতে লাগিল। শরৎ সুশীলার প্রতিমূর্ত্তি, সুশীলার ভালবাসা, সেবা, স্নেহ, সমুদয় একদিকে রাখিয়া মনে মনে তোল করিল।

দেখিল সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য পায়ে ঠেলিয়া সুশীলাকে লইয়া গাছতলায় তৃণপত্র ভোজন করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারি। আবার ভাবিল, "প্রাণেশ্বরী আমার সর্ব্বকষ্ট দূর করিয়াছে। আমি অনেক তপস্যার বলে, অমন স্ত্রী লাভ করিয়াছি। সুশীলা আমার, আমা বই জানে না। এত রোগে পড়িয়াও, কিসে আমার ভাল খাওয়া হয়, ভাল বিছানাটী হয়, তজ্জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কি ছার বিষয় সম্পত্তি! যাগ—সব যাগ! কোন দুঃখ নাই! সুশীলা বাঁচুক। ভগবান্! সুশীলা যদি বাঁচে, তবেই এ জীবন রাখিব। নহিলে,"—আর শরৎ ভাবিতে পারিল না। সুশীলা বাঁচিবে না—এ ভাব মনে আনিতে পারিল না। উপস্থিত বিপদের বিষয় তিলার্দ্ধ চিন্তা না করিয়া, কেবল মাত্র সুশীলার বিবর্ণ দেহ ও ভীষণ রোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু-মোচন করিতে লাগিল।

দোকানের এক ধারে বসিয়া শরৎ নীরবে কাঁদিতেছে, এমন সময় শরতের প্রিয় বন্ধু শশিভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণের দিকে চাহিয়া শরৎ অধিকতর দুঃখে অভিভূত হইল। শশি শরতের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসিল, ব্যাপার কি? তোমার স্ত্রী কেমন আছে?

শরৎ। সেইরূপই আছে।

শশি। অতো কাঁদ্ছো কেন? হ'য়েছে কি?

শরৎ। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ।

শশি। কি? ব্যাপার কি?

শরৎ। একেতো স্ত্রীর ব্যারাম, তার উপর ব্যবসা মাটী, তার উপর ৬।৭ হাজার টাকা দেনা।

শশিভূষণ শুনিয়া চমকিত হইল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিল। পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিল, কেন এ রকম হ'লো?

শরৎ। জানতো—স্ত্রীকে লয়ে ২।৩ বৎসর আমি বিদেশে ব্যস্ত। এই সুযোগে কর্ম্মচারীদিগের উৎপাত। জিনিষ পত্র যাহাদিগকে হাওলাত দিয়াছে, তাহারা পলাতক। তাহাদের বাটী, দেশ কোথায়, তার খবর কিছু জানা নাই। বলে, অনেক কাপড় ইঁদুরে কাটিয়াছে।

এইরূপে শশিভূষণের সহিত শরচ্চন্দ্রের অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল। ৩.৪ ঘণ্টা পরে, শরৎ অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কোন কোন পাওনাদার নালিশ করিয়াছে, অন্যান্য সকলে টাকার জন্য আনাগোনা করিতেছে। বিষয় সম্পত্তি সমুদায় বাস্তভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা পরিশোধ করিতে হইবেক। এই কথা বলিয়া শরৎ আবার কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে থাকিল। আবার ঘাড় তুলিয়া প্রাণের বেগ প্রাণে চাপিয়া বলিল, "এজন্য আমার ক্লেশ নয়, কিন্তু শশি! এ বিপদের কথা সুশীলাকে কি প্রকারে বলিব! একেত রোগে মৃতপ্রায়, একথা শুনিলে সুশীলা আর বাঁচিবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র, শশীর অন্তঃকরণ ভেদিয়া একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। শশি কাঁদিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ পরেই আবার একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল, 'শরৎ! তোর ভয় নাই, আমি প্রাণ দিয়া তোর সাহায্য করিব। আর তোর স্ত্রী যেরূপ বুদ্ধিমতী ধৈর্য্যশালিনী, তাহাতে তোর ভয় নাই। আমার মা ও দিদির মুখে তোর স্ত্রীর যেরূপ গুণের কথা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বেশ মনে হয়, তোর এ বিপদের

কথা শুনিলে, তোর দুঃখ দূর করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

শশিভূষণের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, একজন পত্রবাহক একখানা পত্র শরতের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। পত্রের উপরে সুশীলার হাতের লেখা। রোগের অবস্থার লেখা বলিয়া অক্ষরগুলি ভাল হয় নাই—নিস্তেজ; কিন্তু পূর্ব্ব পত্র সকলের লেখার অপেক্ষা এবারের লেখায় যেন একটু তেজ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখা দেখিয়া শরৎ একটু যেন আশ্বাসিত ভাবে পত্রখানি খুলিল। হায় ভগবান্! যা ভাবিতেছি তাই কি হবে, এই কথা বলিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিল :—

শ্রীশ্রীহরি শরণং। সন ১২৮২ সাল।
১০ই বৈশাখ।

প্রাণনাথ!

তোমার কয়েকদিন চিঠি না পাইয়া ভাবিত আছি। তুমি যে দিন হইতে কাছ ছাড়া হইয়াছ, সেই দিন হইতে তোমার হাতের লেখা পত্রগুলি, ২।৩ বার করিয়া পাঠ করি এবং তাহা-তেই সময়টা এক প্রকার সুখে কাটাই। একটা শুভ সংবাদ এই যে, তিন দিন আমার জ্বর হয় নাই। আহারে রুচি দিন দিন বাড়িতেছে, রাত্রে নিদ্রা মন্দ হয় না। কবিরাজী ঔষধে উপকার হইতেছে। দোকানের সংবাদ কি লিখিবে। একটা দুঃস্বপন দেখিয়াছি, "আমাদের নাকি অনেক টাকা দেনা হই-য়াছে।" এতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াই শরৎ অস্থির ভাবে রোদন করিতে লাগিল। শশিভূষণ ভয় পাইল।

বলিল কি ? কাঁদ্‌ছো যে! সুশীলা ভাল তো ? শরৎ তখন সাশ্রুনয়নে শশীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাই রে! সুশীলা যে দুঃস্বপন দেখিয়াছে, তা হা ভবিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, আমি কেমন করিয়া লিখিব যে, তোমার দুঃস্বপ্ন ঠিক হইয়াছে।

শশি বলিল, "সে যাগ, শারীরিক খবর কি ?

শরৎ কহিল, "ভাই! ঈশ্বর তত নিষ্ঠুর হন নাই—আহারে রুচি দিন দিন বাড়িতেছে। শশি রে! আমার বিষয় যাগ, ঘর বাড়ী যাগ, সুশীলা যদি বাঁচে, আমি সব সহ্য করিতে পারিব।

শশি। ভয় নাই, সুশীলা ভাল হবে।

শরৎ। তাই বল ভাই—কি জানি বুঝিতেছি না—হয় তো বিপদের উপর বিপদ হবে, হয় তো বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে শরৎকে সুশীলা-হারা হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তে হবে।

শরতের অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল দেখিয়া, শশিভূষণ আপনার উত্তরীয় দ্বারা শরতের চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "শরৎ আর কাঁদিস্‌নি"—তুই শীঘ্র এখানকার কাজ শেষ ক'রে মুঙ্গের যা! এখন একখানা চিঠি লেখ, এ সব কথা এখন খুলিস্‌নি। সময় বুঝে কাছে ব'সে খুলে বলিস্। এই বিপদে, তুই, স্ত্রী যে কি সামগ্রী বুঝিবি। তারপর পত্রে কি লিখেছে পড়। শরৎ মনটা স্থির করিয়া, সুশীলার মঙ্গল সংবাদে একটু বলিষ্ঠ-প্রাণ হইয়া আবার পত্র পড়িতে লাগিল :—

আমার বোধ হয় দেনা হওয়াই সম্ভব। তুমি আমার ব্যয়রামে কয়েক বৎসর যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে ব্যবসায় অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। আর বিপদের সময় বিপদ হওয়াই সম্ভব। যা হ'য়েছে সে জন্য ভাবিত হইবে না। তুমি কেমন আছ

লিখিবে, কলিকাতায় খাওয়া দাওয়ার খুব কষ্ট হইতেছে, তা বুঝিতেছি। খুব সাবধানে থাকিবে। আসিবার সময় পার তো দুই একখানা ভাল পুস্তক আনিবে। ইতি—

তোমার
সুশীলা।

পত্র পাঠ সমাপন করিয়া, শরচ্চন্দ্র সুশীলার মঙ্গল সংবাদের ভাবে একটু আনন্দাভিভূত হইল। উপস্থিত বিপদের দংশন-জ্বালা জুড়াইতেছে বোধ হইতে লাগিল। এই ভাবে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল! সুশীলা বাঁচিলে, দারিদ্র্যকে কণ্ঠের হার করিতে পারি। শশিকে সে কথাটী বলিল। শশি শুনিয়া একটু আনন্দের ছায়ায় যেন বিশ্রাম করিতে লাগিল। শশি বলিল, শরৎ! তুই যে এত লেখা পড়া শিখেছিস্, এত ইংরাজী সংস্কৃত উদরস্থ করেছিস্, তাহাতে তোর মনে যে রক্ত হয়েছে—তার পরিচয় আমি অনেক বার পেয়েছি। তোর ৫০ হাজার টাকা গেল, ঘর বাড়ী যাবে, এ যে কি ভয়ানক বিপদ—কি ভীষণ সর্ব্বনাশ; অন্যে হ'লে পাগল হ'তো, না হয় বিষ খেতো, বা দেশত্যাগী হ'য়ে চ'লে যেতো। তুই যে এহেন বিপদের তুফানকে ফু দিয়া উড়াইয়া বলিতেছিস্, "সুশীলা বাঁচলে দরিদ্রতাকে কণ্ঠের হার ক'রতে পারি,"—এই কথাটীর ভিতরে তোর শিক্ষার অস্থিমজ্জা পাথরের মত হ'য়ে গিয়েছে দেখে, আমার মনে এই একটা ভাব উঠ্‌ছে যে, যে প্রকৃত শিক্ষিত—তার কাছে বিপদ বিপদই নহে। তোর মুখে তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাচ্ছি। বিপদে যে শিক্ষিতের পরীক্ষা—তাতো বেশ

দেখ্‌লাম। ভাই ভগবান্ তোকে জ্ঞান-সুখে সুখী করেছেন। জ্ঞানে যার সুখ—প্রাণে যার সুখের ফোয়ারা—তার আবার কষ্ট কোথায়?

শশিভূষণ বিপদে শরতের ধৈর্য্য-ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শশিভূষণের কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র বলিল, "ভাই শশি, আমি সব সহ্য করিতে পারি—সহ্য করিতেছি কিন্তু—;" বলিয়াই শরৎ নিস্তব্ধ হইল--অন্তর্নিহিত ভীষণ জ্বালাকে চাপিতে লাগিল, নয়নতলে অশ্রুবেগকে সম্বরণ করিল—চক্ষের জল চাপিয়া, তার পর দুঃখ-জড়িত স্বরে বলিল, "কিন্তু যে সুশীলা হাস্য বই জানে না, এমন দারুণ রোগেও যার মুখের হাসিটুকু কমে নাই, যে বলে আমার এই হাসি চিতার আগুণে মিশিবে, সেই সদা হাস্যমুখী প্রফুল্লহৃদয়া সুশীলাকে কি প্রকারে এ নিদারুণ অবস্থার কথা বলিব। আহা! আমি কি প্রকারে সুশীলার চাঁদ মুখের হাসি-টুকু কাড়িয়া লইব। আর সুশীলা বাঁচিবে না—এ খবর শুনি-লেই প্রাণত্যাগ করিবে। একে স্বভাবতঃ কোমলা, আনন্দে প্রতিপালিতা তাহাতে জীর্ণ-কলেবরা; এ সংবাদ তার প্রাণে দারুণ শেলের ন্যায় আঘাত করিবে।"

শশীভূষণ বলিল, "হাঁরে! যার স্ত্রী ভীষণ রোগেও মুখের হাঁসি বজায় রাখিতে পারিয়াছে—যার স্ত্রী বলে, আমার মুখের হাঁসি শ্মশানের আগুণের সহিত মিশিবে; যে স্ত্রীর—এমন বিজ্ঞ স্বামী—এই সামান্য বিপদের কথা তাহাকে শুনাইতে, চিন্তিত—ব্যথিত—ভাব-ভরে অভিভূত; শরৎ! আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এ বিপদের কথা শুনিলে তোর স্ত্রী কাঁদিবে না, হাঁসিবে—তোর স্ত্রী কখন আপনাকে হতভাগিনী ভাবিবে না, বরং

এই বিপদের সময়ে তোর প্রাণে বল সঞ্চয় করিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিশ্বাস করিবে। তুই যে সতীকে পেয়েছিস—সসাগরা পৃথিবীখানা তার পায় নখের সমান হয় না। তুই কিছু ভাবিসনি—কিছু ভাবিসনি। আমি তোর সঙ্গে মুঙ্গের যাব—সেখানে কিছু দিন থাক্‌ব।

কিছুক্ষণ পরে শশীভূষণ, কাল আবার দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া গেল। কলিকাতার কার্য্যাদি সমাপন করিয়া শরচ্চন্দ্র দেশে গেল। গিয়া জমী, বাগান, বিক্রয় করিল, আপনার বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করিল। শরৎ ইহাতে কাঁদিল না—ভাবিত হইল না—কর্ত্তব্য কর্ম্ম গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিল। দেশের কোন কোন আত্মীয়া রমণী শরতের কাছে বসিয়া ব্যাকুল প্রাণে শরতের ভিটা বিক্রয় দেখিয়া কাঁদিয়াছিল। গ্রামের অনেকে শরৎকে ভিটা বিক্রয় করিতে মানা করিয়াছিল। কিন্তু না করিলে ঋণ পরিশোধ হয় না দেখিয়া, শরৎকে ধৈর্য্য ধরিয়া তাহা করিতে হইল। শরৎ যে দিন বিক্রয়াদি করিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিল—তখন কেবলমাত্র একবার ভিটার দিকে তাকাইয়া ‘সুশীলা আয়, এ ভিটায় আর তোমার থাকা হবে না, এই বলিয়া দু এক বিন্দু অশ্রুজল ফেলিয়াছিল—সেই অশ্রুজল দেখিয়া অনেকে অজস্র-অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। শরৎ কলিকাতা যাত্রা করিল; সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক রাস্তায় অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া, অশ্রুজলের সহিত শরৎকে বিদায় দিল। সেদিন গ্রাম শরতের জন্য—সুশীলার জন্য কাঁদিল। সেদিন সকলে গ্রামখানা ফাঁক ফাঁক বোধ করিল।

পাওনাদারদিগের টাকা কড়ি পরিশোধ করিয়া শশীভূষণকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মুঙ্গের যাত্রা করিল। মুঙ্গের পঁহুছিল।

মুঙ্গেরের বাটীতেও আর অধিক দিন থাকা সম্ভব নহে। টাকা কড়ি সামান্যই আছে। আর কয়েকদিন পরেই সুশীলাকে লইয়া ভাসিতে হইবে। এই সব ভাবের স্রোতে—ভাসিয়া, শরৎ সুশীলার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি। সুশীলা প্রাণে প্রাণ পাইল। কিন্তু শরতের মূর্ত্তিতে কি এক অব্যক্ত গুপ্ত মর্ম্ম-বেদনা পাঠ করিয়া বিষণ্ণ-চিত্ত হইল।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল অমন দেখিতেছি কেন ?

শরৎ।—না—কিছু নয়—পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি ব'লে।

সুশীলা। আমার প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে—সব ভালতো ?

শরৎ। কিছু ভাবনা নাই—এখন খানিক বিশ্রাম করি। বাহিরে শশী এসেছে—একছিলিম্ তামাক দাও, বাহিরে যাই।

একছিলিম তামাক ও হুঁকা কলিকা লইয়া শরৎ বাহিরে যাইল। দাসী আসিয়া বলিল, বাবু আমাকে দেন, আমি তামাক সাজি। শরৎ, "থাক থাক" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শরৎ ও শশীভূষণ বাহিরের ঘরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিল। শশী জিজ্ঞাসিল 'সব কথা বলেছিস? না ব'লে থাকিস বলগে যা।'

শশীর মুখের কথা শুনিয়া শরতের যেন সমুদয় হৃদয়ে সহস্র সর্পদংশনের যাতনা উপস্থিত হইল। শরৎ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত স্থির ভাবে বসিয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাতরস্বরে

বলিল 'তোমার ঈশ্বরের দিব্য' এ অবস্থায় আর সুশীলার উল্লেখ করিও না। এ দারুণ ঘটনা শুনিলে এখনি হতভাগিনী প্রাণ-ত্যাগ করিবে।

শশীভূষণ একটু চমকিত হইয়া বলিল, সেকি! আজ না না কালতো শুনিবে। তাকে এখনি বলগে। তাকে না ব'লে কাকে বল'বে? আমাকে বলবার আগে তাহাকে জানান উচিত ছিল। আর তুমি তাকে কি লুকাইয়া রাখিতে পারিবে? তোমার হাব ভাব দেখিয়া সে সব ধরিয়া ফেলিবে। তুমিতো জান, সংসারের বিপদে স্ত্রী যতটা মনে সাহস দিতে পারে— স্বামীর মনকে সুস্থ রাখিতে পারে, এমত আর কেহই নহে। তুমি মনে কর, তার বড় কষ্ট হবে, কিন্তু বলে একবার দেখ দেখি; তোমার স্ত্রীর ভিতরে যত কিছু সৌন্দর্য্য লুকান আছে, সব এ সময়ে প্রকাশিত হবে।

শরৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "চিরকালটা সে হেসে খেলে বেড়িয়েছে—কষ্ট কাকে বলে সে জানে না। আমি কেমন করিয়া বলিব, যে তোমার স্বামী পথের ভিখারী হইয়াছে। ভাই! এ দরিদ্রতা সে কি প্রকারে সহ্য করিবে? যাহা কখন শুনে নাই—ভাবে নাই—তাকে আজ তাই ভোগ করিতে হইবে। তাকে যে সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে—এ দশা দেখিলে যে সকলে তাকে ঘৃণা করিবে। এ কথা শুনিলে তার বুক যে ভেঙ্গে যাবে, হা ভগবান! তোর মনে কি এই ছিল;— বলিয়া শরৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিয়া শশীভূষণ বুঝিল, বন্ধুর দুঃখের উচ্ছ্বাস অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। শরৎ স্থির দৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিয়া রহিল। পরিশেষে ঘাড়

নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না—না আমি একথা বলিতে পারিব না।” অমনি বক্ষঃ বহিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

ব্যথিত প্রাণে শশী বলিল, তুমি কি ক'রে এ সব স্ত্রীর কাছ হ'তে গুপ্ত রাখিবে। এ সব তারে জানায়ে দরকার। তোমাকে নিশ্চয়ই এখনকার মত চাল চলিতে হবে। তোমার স্ত্রীকে দু একদিন পরে দরিদ্র বেশ পরাতে হবে; তবে তুমি তাকে সব না ব'লে কি করবে? প্রণয়ের কোমলতায় থাকিবও না—এখন বিপদের সঙ্গে ভীষণ হও। শুনিতে শুনিতে, শরতের মূর্ত্তির ভিতর দিয়া যন্ত্রণার গরল-স্রোত প্রবাহিত হইল—শরৎ বসিতে পারিল না, চক্ষু মুদিয়া দুঃখের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া শয়ন করিল। শশীভূষণ একটু নীরবে থাকিয়া, শরতের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, তাতে আর ক্লেশ কি ভাই! তুমিতো চিরকালই বাহ্য সুখকে ঘৃণা করিয়া থাক। তোমার স্ত্রীর বিষয় আমি যতদূর জানি, তাহাতে বোধ হয় তাকে লয়ে সুখী হবার জন্য তোমার অট্টালিকার প্রয়োজন নাই। শরৎ বলিল—স্ত্রীকে ল'য়ে আমি পাতার কুটিরে সুখী হ'তে পারি—সুশীলাকে ল'য়ে বনে বনে, শ্মশানে শ্মশানে অনাহারে অনিদ্রায় মহাসুখে থাকিতে পারি।” প্রণয়ের বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া শরৎ এই কথা বলিয়াই উঠিয়া বসিল। শশীভূষণ দেখিল, শরতের মনে হঠাৎ বলসঞ্চয় হইয়াছে। শশীভূষণ শরতের একটু গা ঘেসিয়া বসিল, হাত ধরিয়া বলিল, “আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি যেমন সুশীলাকে পাতার কুঁড়েতে লয়ে সুখী হইতে পার, তোমার স্ত্রীও তোমায় লয়ে বনবাসে, এমন কি কারাবাসেও সুখী

হইতে পারে। আমার এ কথায় তুমি অবিশ্বাস করিও না। আর তুমি নিশ্চয় জানিবে, এ অবস্থায় সুখী রাখিবার জন্য তোমার স্ত্রী এত প্রয়াস পাবে যে, সম্পদের সময় তত চেষ্টা, তুমি দেখিতে পাও নাই। ইহাতে সে আপনাকে গরবিনী বোধ করিবে। স্ত্রীর হৃদয়ের প্রেম যে কি মধুর, কি সুশীতল সৌরভ, তাহা স্বামী সম্পদের সময় বুঝিতে পারে না। বিপদের সময় না হইলে, স্ত্রীর অধরের মধুর হাসির মিষ্টতা অনুভূত হয় না, স্ত্রীর সতীত্বের মনোমোহন সঙ্গীতের মধুরতা বুঝা যায় না। বিপদকালে যখন স্বামী চারিদিকে অন্ধকার দর্শন করে—প্রাণ যায় যায় বলিয়া অনুভব করে, তখন স্ত্রীরত্ন যে কি মহাসামগ্রী—তাহা বুঝা যায়। স্ত্রীর স্নেহ-প্রণয় দৃষ্টিতে প্রেম সম্ভাষণে, অমৃতময় হাস্যে, এবং মিষ্টরোমাঞ্চকারী চুম্বনে, যে কি অপূর্ব্ব অম্লান স্বর্গামৃত লুকান আছে, তাহা যে বিপদে আকণ্ঠ ডুবিতে ডুবিতে, সম্ভোগ করিয়াছে—সেই বুঝিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বেই শরতের মনে স্বভাবতঃ বল সঞ্চিত হইতেছিল, এখন বন্ধুর উপদেশে সে বল বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইল। শরৎ তখনি স্ত্রীর কাছে গিয়া সমুদয় খুলিয়া বলিতে বলিতে বলিষ্ঠ-হৃদয় হইল।

রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন হইলে, শশীভূষণ বাহিরের ঘরে শুইয়া থাকিল। শরচ্চন্দ্র স্ত্রীর ঘরে গমন করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে, শরচ্চন্দ্র বাহিরের ঘরে শশীভূষণের সহিত সাক্ষাত করিল। গাত্রোত্থান করিয়া বসিল—বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ?

শরৎ। সব বলিয়াছি—

শশী। কি প্রকার দেখিলে?

শরৎ। স্বর্গের দেবী বলিয়া বোধ হইল। শুনিতে শুনিতে যেন তার একটী প্রাণের ভারী বোঝা নামিয়া গেল। একটা নূতন তেজ তার প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে আমার গলা জড়াইয়া বলিল, "তাতে আর ভয় কি? তাই বুঝি, তখন তোমার মুখে হাসি দেখি নাই—তুমি মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিলে?" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল—আমার মুখের উপর মুখখানি রাখিল—কিছুক্ষণ নীরবে থাকিল। তার পরে, মুখে চুম্বন দিয়া বলিল 'তা তুমি তখনি বলিলে না কেন? ভয় কি? ভাবিও না—তোমার সঙ্গে আমার গাছতলায় থাকা যা, আর ত্রিতলে বাস করাও তা।" আবার আমার হাতখানি তার উপরে রাখিয়া বলিল 'বল—তুমি আর এজন্য দুঃখ বোধ করিবে না। বল—আমার মুখের হাসিতে তোমার সকল অবস্থা বজায় দেখিবে।' ভাই রে! একথা শুনিতে শুনিতে আমার প্রকৃতি যেন অবশ হইল—ভাবিলাম, সতী স্ত্রী কি অমূল্য সামগ্রী!

শরৎ আবার বলিল 'ভাই! হতভাগিনীর নিতান্ত দুরদৃষ্ট; দরিদ্রতার ক্লেশ তো কখনও ভোগ করে নাই—পুস্তকে দরিদ্র-দ্রতার কথা পড়িয়াছে মাত্র—লোকের মুখে শুনিয়াছে মাত্র; কিন্তু যখন দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, তখন যে কি দশা হবে, তাই ভাবি!

শশীভূষণ বলিল 'এখনও তোর স্ত্রীতে অবিশ্বাস? যার অমন সতী স্ত্রী, তার আবার কিসের ভয়? কিসের দুঃখ? আর যে স্ত্রী এমন সময়ে, অমন রুগ্ন অবস্থায়—অমন ভাব দেখায়,

সে স্ত্রীকে লয়ে তুই বাঘ ভালুকের মাঝে যে সুখী হ'তে পারিবি।

শরৎ বলিল 'সব বুঝি—জানি—তবে যে আমি অমন স্ত্রীকে সুখে রাখিতে পারিলাম না—এই আমার দুঃখ রহিল—মরিলেও এ দুঃখ যাবে না। এই রোগের সময়েও ভগবান বিপদ ঘটালেন! হায় হায় সবই অদৃষ্ট!

শশী জিজ্ঞাসিল 'তোমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে কিছু স্থির করিয়াছ?

শরৎ। না—তাহা কিছু করি নাই। সে জন্য ভাবি না—যা হয় হবে। এইরূপে শশীর সহিত অনেক কথা হইতে লাগিল।

শশীভূষণ ২।৩ দিন থাকিয়াই অন্যত্র গমন করিল।

এই বিপৎপাতের জন্য সুশীলার প্রাণে কোন ক্লেশ, দুঃখ—বা বিমর্ষতা কিছুই দেখা গেল না। বরং যত্ন করিয়া প্রাণে বল সঞ্চয় করিতে লাগিল, স্বামীকে নানা কথায় সুখী রাখিবার প্রয়াস পাইতে থাকিল। স্বামীও, স্ত্রীর এই সব ভাবে বিপদকে সৌভাগ্যের মূর্ত্তি ধরিতে দেখিতে লাগিল।

বিপদটি ভয়ানক অন্ধকার হইলেও সুশীলা সে আঁধারে আলোক। শরচ্চন্দ্র দেখিল, সুশীলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। ৫।৬ দিনের মধ্যে সব রোগ কোথায় দূরীভূত হইল—সুশীলা সবলা ও সুস্থা হইল। মুখের হাসি দিন দিন ফুটিতে লাগিল—কথা দিন দিন মধুরতর হইল। এ বিপদে, শরৎ সুশীলার সুরভিময়ী সুশীতল ছায়ায় আপনাকে ভাগ্যবান বোধ করিল।

কয়েক দিন পরে দেশে, কোন আত্মীয় প্রদত্ত একটী বাগান

পাইয়া, শরৎ সেই বাগানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকা স্থির করিল। একদিন সুশীলা আহারের পর, শরতের কাছে বসিয়া বলিল—তুমি কি মনে করিতেছ, তোমায় চাকুরি করিতে দেব?

শরৎ। তাই হবে।

সুশীলা জানিত, শরৎ চাকুরি করাকে কুকুরবৃত্তি অপেক্ষা—নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা—ভীষণতর বলিয়া অনুভব করে। তাই স্বামীর কথার উত্তরে বলিল—'না তা হবে না—আমি বাঁচিয়া থাকিতে হবে না। তুমি যেমন স্বাধীন ছিলে, আমি তেমনি রাখিব—তুমি অধ্যয়ন, চিন্তা, ঈশ্বর তপস্যা ভালবাস, তাই, করিবে; আর আমি যে উলের কাজ জানি, তাহা করিব। ডোমেদের নিকট ধুচুনি, ধামা বুনিতে শিখিব। তাহাতে আমি তোমায় ১০।১২ টাকা দেব। তাহাতে আমাদের চলিবে—তোমাকে চাকুরি করিতে দেব না।

সুশীলা শরতের জন্য ধুচুনি ধামা বুনিতে শিখিতে চাহে, দেখিয়া শরতের প্রাণের অস্থিগুলা মুচড়াইয়া গেল—দুঃখকে চাপিয়া বলিল তাতে কি? এই যে কত লোক চাকুরি করিতেছে, ওতে আর কষ্ট কি?

সুশীলা বলিল 'না তা হবে না—স্বাধীন ভাবে এক বেলা খাই, সে ভাল; দাসত্বে ঝাঁটা মারি—চাকুরি করিতে দেব না। তাতে তোমার অসুখ হবে। তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকিলে আমার সুখ। বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া কি তুমি ঘৃণিত দাসত্বে অবনত হবে—তা হবে না।

অনেক কথোপকথনের পর, দেশের বাগান মধ্যে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকা স্থির হইল।

চারি মাস পরে শশীভূষণ বন্ধুর গ্রামে গমন করিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাগানে উপস্থিত হইল। প্রান্তরের পাশে একখানি আমের বাগান, সেই বাগানে একটী সামান্য কুটীর—মাটীর দেওয়াল—তালপাতার চাল। শশীভূষণ দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, আগে শরতের এমনি গোয়ালঘর ছিল, সেই গোয়ালঘর আজ শরতের বিলাসভবন, সকলি অদৃষ্টে ফলে! কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিল, কুটীরের দাওয়ায়, একটী অসামান্যারূপা রমণী মাথার কাপড় খুলিয়া বসিয়া আছে, বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছে, দাওয়ার নিম্নে ৩টী নূতন ধুচুনী, ২টী বেতের ধামা, আর অনেকগুলি বাঁশের চেয়াড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। কুটীরের চারিদিকে রসালতরু। সেখানে লোকজন বড় যায় না। শশী-ভূষণের জুতার শব্দ শুনিয়া রমণী ব্যস্তভাবে মাথায় কাপড় দিল, মুখ ফিরাইয়া ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অমনি বন্ধু মহানন্দে বাহিরে আসিয়া শশীর হস্ত ধরিল। বন্ধু বলিল, শশী তুই এসেছিস! আজ আমার বড় আনন্দ। মনে ভেবেছিনু, তুইও বুঝি বিসর্জ্জন করিলি। ভাই! আত্মীয় স্বজন আর সেদিন হইতে কেহ খোঁজ খবর লয় না, তুমি যে এলে?—কথা শুনিয়া শরতের গলা ধরিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, ভাই! বন্ধুকে এসব কথা বলে কষ্ট দিতে আছে? শরৎ! আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি, বলিয়াই শশীভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল। শশীভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল "এসব ধুচুনী ধামা কে করিল? শরৎ বলিল" ভাই আমি আর কাঁদি না, অন্যে একথা শুনিলে কাঁদিয়া ফেলিত, কে করেছে, কি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি যা বলেছিলে তাই ফলেছে।

আমি খুব সুখে আছি—সুশীলা আমাকে চাকুরী করিতে দেবে না; কি করিব বল?

দুজনে কুটীরে প্রবেশ করিল। সুশীলা একখানি ছেঁড়া মাদুর বাহিরের দাওয়ায় পাতিয়া দিল। শরৎ ব্যথিত স্বরে কহিল, ভাই! আগে কলিকাতার বাটীতে বসিবার জন্য ভাল চেয়ার আসন পেতে, এখন এই ছেঁড়া মাদুরে বস। শশী বিনীত ভাবে, আর্দ্র বচনে বলিল 'হা শরৎ! তোর সঙ্গে কি আমার সে রকম ভাব? না সে রকম বন্ধুত্ব? তুই কি জানিস না, স্ত্রীজাতির মধ্যে আমার স্ত্রী যেমন ভালবাসার সামগ্রী—পুরুষ জাতির মধ্যে তুই আমার তেমনি ভালবাসার সামগ্রী।

সুশীলা কুটীরের ভিতরে থাকিল। দুই বন্ধুতে নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। অনেক কথার পর শশী জিজ্ঞাসা করিল, শরৎ! তোমার এই জীবনের পরিবর্ত্তনে তোমার স্ত্রীর কি মনে কিছু কষ্ট হয়েছে? শরৎ একটু সুখের—শান্তির—হাসি হাসিয়া বলিল, কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক—এ দরিদ্রতায় ওর যত আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখি, সম্পদের দিনে তত দেখি নাই। ওর প্রণয়, ওর স্নেহ, ওর যত্ন, আমায় আগেকার অপেক্ষা অধিক সুখী করেছে। আগে ওর মাঝে মাঝে ব্যারাম পীড়া হ'ত; তাতে আমার ক্লেশ হ'ত; কিন্তু ভগবানের কৃপায় আজ কাল ওর আর ব্যারাম নাই। ও যেন আর সে সুশীলা নয়! আমি যদি কখন এই পরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ হই, তখন ও কাঁদিতে কাঁদিতে "টাকা কড়িতেই বুঝি তোমার সুখ—আমায় বুঝি ভাল লাগে না।" ভাই আমি যে তখন কত সাহস, কত আনন্দ পাই তা আর কি বলিব! বলিতে কি আগে

কার চেয়ে আমরা দুজনে বড় সুখে আছি। ও এখন নিজে রাঁধে, নিজে ক্ষারে কাপড় কাচে, নিজে ধান ভেনে আনে, নিজে গোবর কুড়ায়, গোবর দেয়, নিজে চরকা কেটে সুতা তৈয়ার করে। আমি বাঁস আনিয়া দি—তাহাতে ধূচুনী চুবড়ী তৈয়ার করে, নিজে উলের টুপি মোজা তৈয়ার করে। ওই সব চালাচ্ছে। আমি পড়ি, চিন্তা করি, লিখি। একখানা দর্শনের বই লিখিতেছি।

কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে, সুশীলা ঘরের ভিতর হইতে ১ খানি ২০৲ টাকার নোট বাহিরে শরতের কাছে দিল। শরৎ নোটখানি লইয়া বলিল ভাই! তুমি যে নোট পাঠাইয়াছিলে তা এখন লও—আমাদের যখন প্রয়োজন নাই, তখন দরকার কি? ও টাকা তোমার উপকারে লাগিবে। যখন নিতান্ত অচল হবে, তখন না হয় দিও।” শশীভূষণ নোট দেখিয়া বিস্মিত হইল। শশী ম্লান ভাবে বলিল ‘আমি যাহা দিয়াছি—লব না। তোরা কি আমায় পর ভাবলি’ এই কথা বলিয়াই শশী কাঁদ কাঁদ হইল। নোট খানি হাতে লইয়া, ঘরের ভিতর সুশীলার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল ‘মা আপনি এ রকম করিবেন না। এ টাকা যদি না লন, আমি আর আসিব না, বুঝিব, আমাকেও বিষয় সম্পত্তির সহিত পরিত্যাগ করেছেন। আমি আপনার ছেলে, ছেলের দান লউন।

সুশীলা অগত্যা লইল। শশী বাহিরে আসিয়া বসিল।

সতী স্ত্রীকে পর্ণকুটীরে লইয়া শরচ্চন্দ্র যে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছে, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, সে সুখের কণামাত্র পাইলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

স্বামী।

ফাল্গুন মাস। বেলা দ্বিপ্রহর। নীলাকাশ গভীর নীলিমায় পরিপূর্ণ। আকাশের একুল ওকুল রৌদ্রপূর্ণ। চারিদিক আম্র মুকুলের গন্ধে ভুর্ ভুর্ করিতেছে। একটী গণ্ড গ্রামের কায়স্থ-দিগের বাটীর জানালার কাছে একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কচি যুবতী বসিয়া আছে। গ্রামের রাস্তার ধারেই সেই বাতায়ন। রাস্তার অপর পারে একটী পয়নালা। পয়প্রণালীর দুপাশে দুটী নবীন আম্র বৃক্ষ নূতন মুকুলের ভরে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহা-দেরই একটী শাখায়, ঝোঁপের আড়ালে একটী কোকিল, আম্র-মুকুল গন্ধের নেশায় বিভোর হইয়া কুহু কুহু স্বরে চারিদিকে সুধা বর্ষণ করিয়া যুবতীর প্রাণের প্রণয়তারে ঝঙ্কার তুলিয়া দিতেছে। ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বায়ু মাঝে মাঝে সেই স্বরে ও ঝঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া গাছের শাখা পল্লব ও পত্র সকলকে নাচা-ইয়া যুবতীর অলকরাশিকে আলিঙ্গনে আন্দোলিত করিতেছে।

বসন্তের নবীন শোভাতে প্রাণী মাত্রেরই আনন্দ। সেই আনন্দ যুবতীর দৃষ্টি ফুটিয়া চারিদিকে মধু বর্ষণ করিতেছে। এদিকে যেমন বসন্তের নবীন শোভা; ওদিকে ত্রয়োদশবর্ষীয়া প্রেমদারও সেইরূপ নবীন রূপের নব প্রস্ফুটিতা মাধুরী। এদিকে যেমন বসন্তের সুকোমল পুষ্পময় কণ্ঠে কোকিলের কুহুস্বর, পাপীয়ার সপ্তম তান, ভ্রমরের গুন্ গুন্ ধ্বনি; ওদিকে নব যৌবনাগমনে প্রেমদার কোমল কণ্ঠে সেইরূপ মধুর স্বর, ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশে সপ্তম তান এবং অলঙ্কারের আন্দোলনে ভ্রমর-নিন্দিত সুমধুর ঠুন্ ঠুন্ রুন্ রুন্ শব্দ।

প্রেমদা জানালায়। প্রেমদার মাথায় সুগভীর কৃষ্ণবর্ণের কবরী—খোলা, যেন শোভা কৃষ্ণ আবরণে কুণ্ডলিত। সুন্দর শাটী পরিধান বস্ত্র। নাকে নোলক ঝলমল করিয়া সেই অপূর্ব্ব মুখের প্রতিমা হৃদয়ে ধরিয়া দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। কপালে গোলাকার ক্ষুদ্রায়তন সূর্য্যকিরণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে—সেই কিরণের অস্ফুট আভা প্রেমদার পাদস্পর্শে বিভোর হইয়া আছে। বসন্তের অতুলনীয়া শোভার ঝোপের মধ্যে পৃথিবীর রসময়ী কবিতা যেন রমণীমূর্ত্তিতে ফুটিবার জন্য সেইখানে বসিয়া আছে।

রমণী-মূর্ত্তি জানালায় বসিয়া কি ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে করপুটে গ্রাম্য দেবতার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে করিতে প্রার্থনা করিল—কি প্রার্থনা করিল? বোধ হয় রমণী এই প্রার্থনা করিল 'ঠাকুর যেন আমার ভাল বর হয়।' নীরবে এই সুমধুর প্রার্থনা শেষ করিয়া রাস্তার ধারে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, এক পরিশ্রান্ত ক্লান্ত পথিক সেই পথপার্শ্বে, আম্রবৃক্ষের ছায়ায়, গামছা পাতিয়া উপবেশন করিল। উপবেশন করিয়া আপনার দুঃখ স্মরণে 'হা ভগবান' বলিয়া একটি গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বৃক্ষশাখে কোকিল সে দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিয়াছিল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু সেই পাষাণভেদী নিঃশ্বাস বায়ুর হিল্লোলে আরোহণ করিয়া, আর কোথাও না গিয়া—আকাশে না মিশিয়া—লগ্ন বুঝিয়া প্রেমদার প্রাণে আশ্রয় অন্বেষণে ধাবিত হইল—প্রেমদার হৃদয়কবাটের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রাণের মধ্যে এক প্রলয় উপস্থিত করিল। যেমন আকস্মিক

ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়, সেইরূপ ঐ দীর্ঘ নিঃশ্বাস, প্রেমদার নূতন গোপনীয় প্রেমসরোবরের সমুদয় জলরাশিকে আলোড়িত করিয়া ফেলিল। সেই নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনিস্বরূপ প্রেমদার হৃদয় ভেদিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিপতিত হইল। প্রেমদা এক নূতন অবস্থায় পড়িল—হঠাৎ কে প্রেমদাকে কাঁদাইল—প্রেমদা মহা বিপদে যেন নিমগ্না হইল। প্রেমদা জানালা হইতে সরিল না। প্রেমদা ভাবিয়াছিল, উঠিয়া যাইবে, কিন্তু পারিল না—উঠিয়া যাওয়া ভাল লাগিল না। সেইখানে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া পথিককে দর্শন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রেমদার দু চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে থাকিল।

পথিকের শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছে, মুখখানি শুষ্ক ও মলিন হইয়াছে, দেখিয়া প্রেমদার বাহু উহার অঙ্গে ব্যজন করিতে এবং অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু রমণীসুলভ লজ্জায় প্রেমদা সেইখানে সেই ভাবেই বন্দিনী থাকিল।

প্রেমদাটার বুদ্ধি সুদ্ধি নাই, কোথাকার কে—এক পথিকের জন্য উন্মাদিনী হইল—গাছের কোকিলের মত সেই বসন্তের কোকিল এখনি কোথায় চলিয়া যাইবে;—এমন পথিককে—অজ্ঞাত—কুলশীলকে—আপনার হৃদয় খুলিয়া দিল।

প্রেমদা বুঝিল না—ভবিষ্যৎ ভাবিল না, পিতা মাতার মানাপমান বিবেচনা করিল না, একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তেজে অভিভূতা হইয়া কোথাকার এক পথিককে প্রাণের স্বামীত্বে বরণ করিল, সেই পথিকের শ্রীচরণে আপনার কুল, মান, অস্থি, মজ্জা, স্বর্গ, নরক সমুদয় বিসর্জ্জন দিল।

রসালের ছায়ায় বায়ুর হিল্লোলসেবায় পথিকের শ্রান্তিদূর হইল। পথিক এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে জানালার দিকে চাহিয়া ফেলিল। সর্ব্বনাশ! জানালার আড়ালে এক সুশীতলা বিদ্যুৎময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইল। সেই রূপরাশি যুবার হৃদয়, প্রাণ, অস্থি, মজ্জা যেন ভেদ করিল। সেই প্রাণরাম রূপ-জ্যোতিতে যুবার দুঃখের নিবিড় অন্ধকার যেন ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিল! যুবা যে প্রেমদার রূপফাঁদে পা দিয়া সামলাইতে পারে নাই—বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে—তাহা প্রেমদা আদতে বুঝে নাই। যেই প্রেমদা মুখ বাড়াইয়া ধীরে ধীরে দেখিতে যাইবে, অমনি যুবার অমৃতদৃষ্টির সহিত প্রেমদার প্রেমলজ্জাপুষ্ট শুভ দৃষ্টির আলিঙ্গন হইল। সেই আলিঙ্গনে, প্রকৃতি ভেদ করিয়া এক মাধুরী—দুজনকে প্রাণে প্রাণে—হৃদয়ে হৃদয়ে—বিপদে বিপদে—সম্পদে সম্পদে—সুখে দুঃখে মিশাইয়া একত্রে পরিণত করিল। দুই জনের আধ্যাত্মিক বিবাহ হইল।

প্রেমদার একটু লজ্জা হইল—জানালার আড়ালে লুকাইল। সে স্থান ছাড়িতে আর ইচ্ছা নাই। কিন্তু ক্রূর সংসার প্রেমের পথে কাঁটা ছড়াইল। প্রেমদার মা বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিল :—

ও পিসি! পিসি!

পিসির উত্তর নাই। পিসি বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। অন্যান্য দিন পিসির মা এক ডাকেই শাড়া পাইত—আজ পাইল না কেন?

মা আবার ডাকিল "পিসি লো—ওলো পিসি!" পিসি এতক্ষণে শুনিল। শাড়া দিতে গিয়া দিতে পারিল না। সে

ডাকে পিমি বড় বিরক্ত হইল। পিমি অন্যান্য দিন মা ডাকিলে আনন্দে উত্তর দিত—আজ উত্তর দিতে বড় বিরক্তি বড় যন্ত্রণা অনুভব করিল। মা এবার উত্তর পাইল না—তখন রাগিয়া বলিল 'ও মুখপুড়ি! বুড়ো মেয়ে এ দুপুর বেলা কোথা?'

বলিতে বলিতে মা একেবারে বাহিরে আসিল, পিমি আর কি করিবে—আস্তে আস্তে মনে মনে কাঁদিতে কাঁদিতে—মনোক্ষোভে পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মার সঙ্গে বাটীর ভিতর গেল।

পথিক—প্রেমদার ফাঁদে ধরা সেই বসন্তের পক্ষী—গাছতলায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া ভাবিল, "কি আর করিব? যাহা হউক যে বিপদে প'ড়েছি—ইহা হইতে উদ্ধার তো হইতে হবে। আমিতো প্রাণ দিয়ে বসিলাম – ওকি তাই দিয়েছে? যাহা হ'ক যাই—ঘটনার স্রোত কোন পথে আমায় ফেল্‌বে তা জানি না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যুবা একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সেই সুখের স্বর্গ পরিত্যাগ করিল। এবারকার দীর্ঘ নিঃশ্বাসটী বড় হতভাগা—সেটার আশ্রয় আকাশে জুটিল—তবে যদি পিমী সেখানে থাকিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া সেই প্রিয়তমের নিঃশ্বাসটীকে আপনার বক্ষে ধারণ করে তো—দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেচারার মুক্তিলাভ হবে—নতুবা হতভাগাকে অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল ঘুরিয়া মরিতে হইবেক।

পিমী বাটীর ভিতরে গমন করিলে, পিমীর মা বলিল 'এত বেলা হ'ল এখনও ভাত খেলি না—তা না হয় এক দণ্ড ঘরে ব'স—ওমা তা নয়! আয় ভাত খা।'

পিমি বলিল 'না—আমি ভাত খাব না। আমার ক্ষুধা নাই।'

পিমির মা কহিল 'এই যে এতক্ষণ ভাত হয়নি ব'লে রাগ করে বাহিরে গিয়েছিলি। খিদে নাই কিলো! ভাত খা—আর রঙ্গ করিস নি।

পিমির আগে খুব ক্ষুধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর একটী ক্ষুধা আসিয়া সে ক্ষুধাটীকে চাপা দিয়াছে—সে ক্ষুধার জিনিসগুলাকে তিক্ত করিয়াছে—পিমির মা তাহা বুঝে নাই। পিমির তাই ভাত খাইতে ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা সেই জানালার কাছে সেই প্রকারে বসিয়া থাকে—যুবাকে দৃষ্টির ডোরে গাঁথিয়া প্রেমের খেলা খেলে।

পিমি বলিল "আচ্ছা ভাত দে—ভাত বাড়—আমি বাইরে থেকে একবার আসি—জানালার কাছে একটী পুতুল ফেলে এসেছি।"

গাছতলায় বলিলেই ঠিক হইত। কিন্তু পিমি সেটা গোপন করিয়া জানালার কাছে এক মিছা পুতুলের কথা বলিল। আম গাছের কাছে সেই সোণার পুতুলটী দেখিবার জন্য পিমি তাড়াতাড়ি বাহিরে জানালার কাছে গেল—গিয়া আস্তে আস্তে দেখিল। দেখিল, আম গাছ সেইরূপই আছে—তলায় তৃণরাজি রৌদ্র ও ছায়াময়—একটী ছাগল সেই থানে চরিতেছে, কিন্তু তাহা নাই—সে সোণার পুতুলটী কালের স্রোত কোথায় ভাসাইয়াছে। পিমির প্রাণটা মুচড়াইয়া গেল—মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল—অজ্ঞাতে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া, হঠাৎ বাটীর রাস্তার ধারের দ্বার খুলিল—বাটীর বাহির হইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল—এদিকে ওদিকে সজলনেত্রে চাহিল—কিন্তু আকাশ নড়িল না—বিনষ্ট হইল না—গাছটা তার

কষ্টে উপিয়া গেল না—ব্রহ্মাণ্ড সে যুবামূর্ত্তিকে দেখাইতে পারিল না।

পিমি কাঁদিতে কাঁদিতে দ্বার বন্ধ করিল—আপনার অঞ্চলে চ'খের জল ভাল করিয়া মুছিয়া মার কাছে গেল।

মা, পিমির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল 'ও কিলো! চ'খ ছল ছল কর'ছে—মুখ লাল হ'য়েছে কেন? পুতুল বুঝি পাসনি—পুতুলের জন্য এত কান্না কেন? আমি একটা ভাল পুতুল দেবো—বুড়ো মেয়ের এখনও পুতুলের সাধ যায় না! ভাত বেড়েছি ভাত খা—একটা সামান্য জিনিসের জন্য কান্না দেখ না!'

পিমি পুতুল বড় ভালবাসিত—একটী সামান্য পুতুল হারাইলে কাঁদিয়া মরিত।

পিমির মা, পিমিকে ভাত দিল। পিমি আগে এক ঘণ্টা ধরিয়া ভাত খাইত। পিমির পাতে আগে পিপীলিকা আসিয়া কাঁদিয়া যাইত; আজ কিন্তু পিমি ভাল করিয়া কিছু খাইল না। অল্পক্ষণ পরে উঠিয়া যায়—দেখিয়া বলিল, ওলো! আজ তোকে আবার কি রোগে ধরলো? পিমী কিছু বলিল না। ঘাটে হাত ধুতে গেল। পিমী ঘাটে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে। অন্য দিন ঘাটে গিয়া পিমী শীঘ্র শীঘ্র মুখ হাত ধোয়; আজ জলে হাত ডুবাতে দেরি, হাত ধুতে দেরি, কুলকুচা করিতে দেরি। পিমী অনেকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে হাত ডুবাইল। পিমির হাত ডুবানই আছে—তার পর কিয়ৎকাল পরে, অল্পে অল্পে পিমীর হাত সঞ্চালিত হইল। পিমী ২ বার ভাবে তো ১ বার হাত ধোয়, ২টা কুলকুচা করে তো ১০টা ভাবে।

পিমী ঘাটে এত দেরি করিতেছে, দেখিয়া পিমীর মা বড়

বিরক্ত হইয়া দৌড়িয়া ঘাটে গেল। গিয়া দেখে—মেয়ে কি যেন ভাবিতেছে! আমাদের দেশে পিতাপুত্রে রসিকতা চলেনা বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে মা ও মেয়েতে একটু আধটু রসিকতা চলিয়া থাকে।

মা ঘাটে গিয়া একটু সরস মুখে বলিল, "বলি এত দেরি কেন? ভাবছিস কি?" পিসী কিছু উত্তর দিল না—চুপ করিয়া থাকিল।

মা আবার একটু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলি—বের জন্য ভাবিস নাকি?"

শুনিবামাত্র পিসী কৃত্রিম ক্রোধে অধীর হইয়া "মর মর" বলিয়া জল হইতে উপরে উঠিল।

তার পর, পিসী ঘরে আসিল। অন্য দিন পিসী ভাত খাবার পর, আপনি সাজিয়া ৩।৪টা পান খায়, আজ আর পান সাজিল না—খাইল না—একেবারে বিছানায় শয়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বসন্তকালে সকলেই প্রফুল্ল; সকলেরই গায়ে একটু না একটু মাস গজাইতেছে—কিন্তু পিসী সদাই নিরানন্দ, দিন দিন রোগা হইয়া যাইতেছে।

এক মাস পরে, পিসীর মা দেখিল, পিসীর বুকের হাড় বাহির হইয়াছে—পেটে মুখে কালশিরা দেখা দিয়াছে।

মা পিসীকে বলিল 'হালো! তুই দিন দিন অমন হচ্ছিস, কেন? তোর খাওয়া দাওয়া যে দিন দিন উঠে যাচ্ছে।

বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখে পিসীর বাপ, বিবাহের লগ্ন পত্র স্থির করিয়া কলিকাতা হইতে বিবাহের জিনিস পত্র সমভিব্যাহারে বাটীতে আসিল। একখানা গোরুর গাড়ী ময়দা, ঘি, ডাল, তেল, কাপড়, দানসামগ্রী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া বাড়ীর দ্বারের কাছে উপস্থিত হইল। অন্যান্যবার কলিকাতা হইতে জিনিস পত্র আসিলে পিসী আহ্লাদে আটখানা হইত। আজ বিবাহের জিনিস আসিল;—কোথায় আমোদে বত্রিশখানা হইবে,—হঠাৎ পিসীর মুখে যেন কালি পড়িল—চোখ যেন ডুবিয়া গেল—পিসী কাঠের পুতুলের মত বসিয়া একদিকে পাগলিনীর মত তাকাইয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, পিসীর গা গরম হইল। কম্প দিয়া জ্বর আসিল। পিসীর জ্বর দেখিয়া মা'র মনটী বড় খারাপ হইল। স্বামীকে চুপে চুপে বলিল 'তোমার মেয়ে বোধ হয়, আর অধিক দিন বাঁচবেনা; ওর চেহারা দেখলে আমার কান্না পায়। ওই দ্যাখগে জ্বরে ধুঁকছে।

বাপ, হাত পা ধুতে ধুতে দুই কথা শুনিয়া মহা শঙ্কিত হইল। হাত, পা, মুখ ধুইয়া ঘরের ভিতর গিয়া বলিলেন;

মা প্রেমদা!

প্রেমদা শাড়া দিল "কেন?

বাপ বলিল 'তোমার জ্বর হ'ল কেন মা?

প্রেমদা কিছুই উত্তর দিল না। লেপের ভিতরে মুখ লুকাইয়া একটু কার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিল।

ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করায়, জ্বর আরাম হইল বটে, কিন্তু, প্রেমদার ভিতরে মহা পীড়া জন্মিয়াছে। প্রেমদার

সে সোণার দেহ কালী হইয়া যাইতেছে—তাহার সুখ যেন জনমের মত ইহলোক হইতে পলাইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, পিসির গায়ে হলুদের দিন আসিল। পিসির গায়ে হলুদ পড়িল। কাঠের গায়ে হলুদ মাখান যা, আর পিসির গায়ে হলুদ মাখানও তা। গায়ে হলুদের সময়, পিসিকে যে যাহা বলিল, পিসি দায়ে পড়িয়া তাহা করিল।

তার পরেই বিবাহের দিন। রাত্রি ৮টার সময় অনেক ধূম ধাম করিয়া বর আসিল। বাহির বাড়ীতে লোকারণ্য। বিবাহের সভা রাজসভা, বিবাহের বর কিছুক্ষণের জন্য রাজা। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিবাহের লগ্ন সময় উপস্থিত। বর উঠিয়া বিবাহের স্থানে গিয়া মুকুট মাথায় দিয়া বসিল। বরের আজ কত আনন্দ। বিবাহের সময় মানুষের সমুদয় সৌভাগ্যের সম্ভোগ—সে সময়ের মত সুখের সময় মানবজীবনে আর নাই—পৃথিবীতে স্বর্গ-সুখ যদি থাকে তো সেই বিবাহের সময়ে।

পিসীকে কোলে করিয়া সেই স্থানে আলপোনা দেওয়া পিড়ীর উপরে বসাইল। পিসী সুখের স্থলকে সাক্ষাৎ যমালয় বলিয়া ভাবিতেছে। যদি পিসীকে শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত, তো, সে এত দুঃখিতা কখনই হইত না। পিসীর সম্মুখে বর না যম, আর অন্যান্য লোকেরা যেন যমদূত। পিসীর হাত লইয়া বরের হাতে দেওয়া হইল। অমনি পিসীর হাতের ভিতরের রক্তস্রোত যেন বন্ধ হইয়া আসিল—হাতটী যেন মড়ার হাতের মত বরের হাতের উপর স্থাপিত হইল। যদি কেহ জোর করিয়া একটী কেউটিয়া সাপের মুখের উপর পিসীর হাত রাখিয়া দিত, তো, পিসীর এত ভয় হইত না। সেই বরের হাতে পিসীর

হাত পড়িবা মাত্র পিসী যেন আড়ষ্ট হইল। সেই পুরুষের হস্তস্পর্শে যেন পিসির গায়ের রক্তে গরল মিশ্রিত হইল। সর্পদশংনে বিষসঞ্চারে হাতের দশা যেরূপ হয়, পিসীর হাতের দশা যেন কতকটা সেইরূপই হইল। অন্যান্য লোকেরা ভাবিতেছে, পিসীর বিবাহ হইল, কিন্তু পিসী ভাবিতেছে তাহার 'যমালয়ে শ্রাদ্ধ হইল; ভবিষ্যতে নরকে পড়িতে হইবে, তাহারই যোগাড় হইল।'

বিবাহের পর, 'বাসর ঘরে বর কন্যা যাইতেছে। পিসী একজনের কোলে ছিল, কোলেতেই হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। বাসর ঘরে গিয়া বর বসিল। পিসীকে কোল হইতে নামাইতে যাইবে না দেখিল, পিসী মূর্চ্ছিতা। অনেক যত্নে পিসীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরেই মূর্চ্ছা হইল।

পিসীর মা, কি কুক্ষণেই বিবাহ হইল—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই রাত্রেই ডাক্তার আনা হইল। ডাক্তার বলিল, 'এ গোলমালে রাখা হবে না—অন্যস্থলে—ওর মা'র কাছে থাকিতে দাও।'

পিসীর প্রাণে একটু যেন বাতাস লাগিল। পিসী মার কাছে অন্য ঘরে গিয়া শয়ন করিল। মার কাছে পিসির মূর্চ্ছা একবারও হইল না।

পিসীর মা বিছানায় চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল 'মা তুমি অমন হ'লে কেন? বিবাহের সময় মা! ও রকম হলি কেন? বর কি মনে ধরে নি?'

'পিসী' কিছু বলিল না, কেবল নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

আলো জলিতেছিল—পিসীর মা দেখিতে পাইল, দুই চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে। তখন মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'হ্যা পিসী! আমার আজ কোথা সুখের দিন—তোর বিয়ে দেখে আমার সুখ হবে—না তোর এ সব দেখে আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে না। মা! তুই আমার একটী মেয়ে। আমার আর নাই—এমন দিনে অমন ধারা করা কি ভাল।'

এই সব কথা শুনিতে শুনিতে পিসী চোখ কপালে তুলিল—পিসীর দাঁতে দাঁত বসিয়া গেল। 'ওগো আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, ও গো পিসী আমার কোথা গেল গো' বলিয়া পিসীর মা ঘরের ভিতরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাহির হইতে পিসীর বাপ বাসর ঘর হইতে অন্যান্য লোকেরা 'কি হ'ল হ'ল, বলিয়া সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার আসিল। ঔষধ দ্বারা, পিসীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।

পিসীর বাপ, এতক্ষণ পরে মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল।

রাত্রি পোহাইল। বর, বাসরঘর হইতে বাহিরে গেল। বরের মনেও সুখ নাই। একজন বন্ধুকে চুপে চুপে বলিল 'ভাই! গতিক ভাল নয়।'

কিছুক্ষণ পরেই পিসীকে বরের পাল্কিতে বরের বাড়ী যাইতে হইবে। পিসীর সেই দারুণ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। পিসীকে যমালয়ে পাঠাইবার যোগাড় হইতেছে দেখিয়া পিসী আবার মূর্চ্ছিত হইল। এবারে মূর্চ্ছার বেগ অতি ভয়ানক। সে বেগে পিসী এত দুর্ব্বল হইল যে, আর কথা কহিতে পারিল না। পিসী বিছানায় শুইয়া থাকিল। ডাক্তার আসিয়া বলিল, 'এরূপ অবস্থায় প্রেমদাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান যাইতে পারে না।

ধাত যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে—তাহাতে আর ২।৩ বার যদি মূর্চ্ছা হয়—তো প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া প্রেমদার প্রাণে প্রাণ আসিল।

বরযাত্রী সকলে চলিয়া গেল। বর, বরের বাপ, আর দুই একজন থাকিল। কিন্তু প্রেমদার মূর্চ্ছা সেদিন নিবৃত্ত হইল না। দুই দিন পরে বর ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বর চলিয়া গেল। প্রেমদা একটু আনন্দিতা হইল। প্রেমদার মুখ পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু সবল হইল। দিন দিন মূর্চ্ছা কমিতে লাগিল। ১০।১২ দিন পরে প্রেমদা একটু আরোগ্য লাভ করিল।

১৩ দিনের দিন প্রেমদার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমদা শুনিল—শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইবার পর প্রেমদা মাকে বলিল, "মা! তুমি কি আমায় চাও? প্রেমদার মা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল 'অমন কথা কি ব'লতে আছে মা। তুই যে আমার একমাত্র ধন।'

প্রেমদা বলিল 'মা! তবে একটী কথা বলি। তুমি যদি একথা না শুন, তবে আমার প্রাণের আশা পরিত্যাগ কর।' মা! বলিল 'তুমি যা বলবে তাই শুনব। তা হ'লে কি মূর্চ্ছা ভাল হবে?

প্রেমদা বলিল 'আমি আমার শ্বশুরবাড়ী যাইব না। যাহার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছ, তার কথা আমার কাছে খবরদার বলিবে

না। আর আমার শ্বশুর বাড়ীর কোন লোক যেন আমাদের বাটীতে না আসে।' যদি এই কথা মাপিক তুমি কাজ না কর, তো আমি শীঘ্রই মরিব।" অনেক কষ্টে প্রেমদা এতগুলি কথা বলিয়াছিল—বলিয়া ভীষণ মর্ম্মযাতনায় অধীর হইতে থাকিল।

প্রেমদার মা বলিল "প্রেমদা! তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে মা। পাড়ার লোক যে তোমার কত প্রশংসা করে। ছি মা! ছি! জন্ম জন্ম হাতে লোহা দিয়ে সেই ঘর কর। ও সব কথা কি বল'তে আছে।

প্রেমদা আর কিছু বলিল না; ঘাড় হেট্ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রেমদার মা স্বামীকে সব কথা বলিল। প্রেমদার বাপ শুনিয়া বলিল 'তাইতো গা! আমার কপালটা নেহাত মন্দ। অমন পাত্র ৪টী পাশ করা; আজকের বাজারে ৮।১০ হাজার খরচ করে পাওয়া যায় না। হা ভগবান! হতভাগীর কপাল নেহাত মন্দ দেখ্‌ছি। যা হয় তুমি করগে—আমি দেশত্যাগী হয়ে যাই। এ সব কথা আর কাকেও ব'ল না। তা হলে আর মুখ দেখবার যো থাকবে না। লোকে এক ঘরে কর'বে।" এই কথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিৎ করিয়া ভাবিয়া বলিল 'তা এখন ওকে তাই বলগে যাও। তারপর একটু আরাম হলে, গায়ে বল পেলে, আমরা দুজনে সঙ্গে ক'রে ওর শ্বশুর বাড়ীতে রেখে আস্‌ব। না হয় আমরাও সেই বাড়ীতে কিছু দিন থাক'ব। তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছ। এমন ক'রেছ যে একদিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। ওর

ব্যারাম ট্যারাম যে কেন তা বেশ বুঝেছি—ওকে তুমি এমনি মা যেসা ক'রেছ যে ওর আখের একেবারে খেয়ে দিয়েছ।

প্রেমদার শ্বশুর সেদিন সন্ধ্যাকালে চলিয়া গেল। প্রেমদার মা, মেয়েকে বলিল 'আচ্ছা তোর শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না। তাদের আর কি বল; তাদের ছেলের আবার তারা বে দেবে—ভুগ্‌তে হবে আমাদের—যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে প্রেমদার শ্বশুর শ্বাশুড়ি সকলেই রাগিয়া উঠিতেছে। বরের নাম হরিদাস। হরিদাসের আবার বিবাহ দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইহাতে হরিদাসের বাপ মার বড়ই আনন্দ—কেন না একবার বিবাহে তিন হাজার টাকা মারিয়াছিলেন। আবার ৩ হাজার নাই হ'ক, হাজার টাকা তো মারিবেন।

হরিদাসও বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। হরির বাপ, বেইকে একখানি পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইলেন। পত্রবাহক পত্র লইয়া প্রেমদার বাপকে দিল। প্রেমদার বাপের নাম প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণ পত্র পড়িতেছেন:—

শ্রীশ্রীহরি।

পুত্রের বিবাহ দিয়া কোথায় সুখী হইব, না দিন দিন দুঃখই বাড়িতেছে। বউ বেটা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতেছে না। যাহা হউক, অধিক লেখা বাহুল্য। যদি আমাদের সহিত সম্পর্ক রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন,

তো বধূমাতাকে শীঘ্র পাঠাইবেন। পরশ্ব তারিখে উত্তম দিন আছে। উক্ত দিনে পাঠান যদি মত হয়তো, এই লোকমারফৎ খবর পাঠাইবেন। আমরা উক্ত দিবসে পাল্কি পাঠাইব। আর যদি একান্ত না পাঠান তো, আমরা আমাদের ছেলের আবার বিবাহ দিব—ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

পত্র পাঠ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু স্তম্ভিত হইলেন। মুখখানিকে বিবর্ণ করিয়া স্ত্রীকে চুপে চুপে ডাকিয়া সব বলিলেন। স্ত্রী বলিল 'তা কি কর'বো আর? মেয়ের সুখের জন্যই বিবাহ। তা যদি মেয়ের দুঃখই হয় তো এসব সম্পর্কে আর দরকার কি? মেয়ের যে প্রকার ধরণ ধারণ দেখছি, সেখানকার কথা শুনলেই তার জ্বর হবে, না হয় মূর্চ্ছা হবে। আমার মেয়ে আগে, না জামাই আগে? মেয়ে বাঁচেতো জামাই।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু, চক্ষু রাঙাইয়া বলিল 'তোমার আদুরে মেয়েকে লয়ে থাক, আমি টুকনি ল'য়ে দেশত্যাগী হই—আমার মান সম্ভ্রম যে সব গেল!' স্ত্রী রাগিয়া বলিল 'তোমার মেয়ের চেয়ে তোমার মানটা বড় হ'ল কি? যাও তোমার মান ল'য়ে ধুয়ে ধুয়ে খাওগে।'

প্রাণকৃষ্ণ কিছু না বলিয়া, রাগে দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে বাহিরে গিয়া পত্রের উত্তর দিল, "পরশ্ব তারিখে আপনাদের পাল্কি পাঠাইতে হইবে না। আমি স্বয়ং আমার কন্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

পরশ্ব তারিখ আসিল। তারকেশ্বরে যাবার নাম করিয়া, প্রাণকৃষ্ণ বাবু আপনার মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া আসিবে, ইহা স্থির করিল। একখানি পাল্কি আনাইল। মেয়ে পূর্ব্বে

সমুদয় টের পাইয়াছিল। প্রেমদা বুঝিল, তাহাকে আবার সে যমালয়ে লইয়া যাইবার যোগাড় হইতেছে! প্রেমদার মার প্যাটরায় কাগজে মোড়া সাপের বিষ ছিল, সেই সময়ে তাহা মনে পড়িল, প্যাটরা হইতে অন্যান্য জিনিস বাহির করিবার সময় মার অজ্ঞাতসারে সেই বিষ মোড়াটী প্রেমদা হাত-গত করিল।

বাপের সহিত পাল্কিতে উঠিবার সময়, প্রেমদা সাবধানে আপনার বাক্সের ভিতরে বিষের মোড়া রাখিল। প্রেমদা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে—যখন বেগতিক দেখিব, তখনই এই বিষ খাইব—আমার সতীত্বকে কলঙ্কিত করে কাহার সাধ্য?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমদা বাপের সহিত শ্বশুরবাড়ী গেল। মুখ ঘোমটায় সর্ব্বদা ঢাকা থাকিল। ঘোমটা খুলিয়া যে মুখ দেখিল, সেই অবাক হইল। সে গ্রামে সেরূপ সুন্দরী মেয়ে কখনও যায় নাই। মুখ সুন্দর বটে কিন্তু বিমর্ষতায় আচ্ছন্ন—জ্যোতিহীন। প্রেমদা কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না—ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলির সহিতও নহে। নীরবে ঘোমটার ভিতরে যন্ত্রণাময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতিরা কত আদরমাখান কথা কহিতে লাগিল, কিন্তু প্রেমদার হৃদয়ে দুঃখের চাপ ক্রমশঃ ভারি হইতে থাকিল।

প্রেমদা ভাবিতেছিল, তাহাকে যেন সকলে ব্যভিচারিণী করিবার উদ্যোগ করিতেছে—তার আজ মহাবিপদ। সে কথা খুলিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। প্রেমদা সেই গুপ্তকথা

প্রাণে লুকাইয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, মহাগুপ্ত স্থানে যাইবার জন্ত আপনাকে প্রস্তুত করিতে থাকিল।

কালরাত্রি আসিল। প্রেমদাকে হরিদাসের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিন ফুলশয্যা। ফুলশয্যার অন্তান্ত আমোদ প্রমোদ সমাপন করিয়া প্রেমদাকে হরিদাসের বিছনায় শুয়াইয়া দিয়া, অন্তান্ত রমণীগণ চলিয়া গেল। হরিদাস ঘরে খিল দিল। খিল দেওয়ার শব্দ যেন ভীষণ বজ্রের ন্তায় প্রেমদার প্রাণে পতিত হইল। অমনি উন্মাদিনীর ন্তায় পেট কাপড় হইতে বিষের বড়ি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলিল। খাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া বসিল। প্রেমদার সম্মুখে ভীষণ শ্মশান! ঘরের ভিতরের বর্ত্তিকাশিখা যেন শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে।

সেই ফুলশয্যার ভীষণ শ্মশানে জীবনের যাতনায় অন্ধকারে প্রেমদা সেই পথিকের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে একটা ভারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—যেন প্রাণবায়ুর অর্দ্ধে-কাংশ তাহাতে বহির্গত হইল। প্রেমদা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিল—চোখের জলে প্রেমদার বুক ভাসিয়া গেল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, ঘরের বাহিরে স্ত্রীলোকেরা দ্বারের ফুটা দিয়া উঁকি মারিতেছিল। হরিদাস প্রেমদার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া প্রেমদার ক্রন্দনের অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাইল। হরিদাসের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তদবস্থায় ম্লান মুখে হরিদাস প্রেমদার কাছে বসিল। বসিয়া প্রেমদার ঘোমটা খুলিয়া দিল—অমনি প্রেমদা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। হরিদাস প্রেমদার মস্তক আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া পাখার বাতাস দিতে লাগিল, মুখে চোখে জলের ছিটা দিতে থাকিল। পালঙ্কের

আড়াল পড়িয়াছিল বলিয়া বাহিরের স্ত্রীলোকেরা ভিতরের সে সব কাণ্ড আদতে দেখিতে পাইল না।

হরিদাস উপবিষ্ট। আঁটুর উপরে প্রেমদার মাথা রাখিয়া শুশ্রূষা করিতেছে—আর আকুল প্রাণে সেই পদ্মতুল্য মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু মোচন করিতেছে। হরিদাস প্রেমদার এই অতুলনীয় মুখ একদিন সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাতায়ন হইতে দেখিয়াছিল, আর আজ প্রেমদার এই দুর্দ্দশার দিনে আর একবার দেখিল। হরিদাসের সেই প্রেমজলধি আজ উথলিয়া উঠিল। হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমদার সেই সুবিমল মুখে একবার একটী চুম্বন করিল।

প্রেমদা হঠাৎ চক্ষুর পল্লব তুলিল। প্রেমদার মুখের উপরে এ কাহার মুখ? সেই হারাণ মাণিক কোথা হইতে আসিল—ভাবিয়া প্রেমদা আবার কাঁদিতে থাকিল। হরিদাস মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া জিজ্ঞাসিল (কাঁদ কেন)?

প্রেমদা তখন আপনার চখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল "আর কাঁদিব না"।

হ। কেন আর কাঁদিবে না?

স্ত্রী। যাঁহার জন্য কাঁদিতেছিলাম, তাঁহাকেতো পাইয়াছি।" তখন বিষের নেশা প্রবল হয় নাই বটে; কিন্তু প্রেমদার মস্তিষ্ক যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পড়িল। প্রেমদার আকস্মিক আনন্দের তুফান বিষের প্রকোপকে একটু চাপিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আর কত-ক্ষণ রাখিবে? প্রেমদা হরিদাসের মুখের দিকে তাকাইতে তাকা-ইতে বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। যেন প্রেমদার মস্তক স্বর্গের সমুদয় স্নেহ, নন্দন কাননের সমুদয় সুগন্ধ, সহস্র পূর্ণচন্দ্রের

মাধুরি লইয়া স্বামীর সংসার-পীড়িত বক্ষে পতিত হইল। প্রেমদা স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল "তোমার কাছে কেমন করিয়া আসিলাম?" যুবা কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, বিস্মিতভাবে কহিল—সেকি আমার সঙ্গে যে বিবাহ হইয়াছে—ও আবার কেমন কথা?

তখন প্রেমদার বিস্ময় আরও বাড়িল। প্রেমদা যুবার বুক হইতে মাথা তুলিয়া কিয়ৎক্ষণ পাগলিনীর ন্যায় স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। তারপর ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে কহিল 'আমি সর্ব্বনাশ করিয়াছি—আমি না জানিয়া না বুঝিয়া বিষ খাইয়াছি,—এই কথা বলিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে প্রেমদা ঘরের মেজের উপর পড়িয়া গেল। হরিদাস তখন 'সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!' বলিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। ঘরের ভিতর স্ত্রীলোকেরা প্রবেশ করিল। প্রেমদার পিতা শ্বশুর শাশুড়ি সকলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনান হইল। ঔষধ খাওয়ান হইল—সেবা শুশ্রূষার ক্রটী হইল না। কিন্তু বিষ আর নামে না, নামিল না। প্রেমদার পিতা আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

প্রেমদার অন্তিমকালে হরিদাস একবার কাছে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপবেশন করিল। তখন ঘরের অন্যান্য সকলকে সরিয়া যাইতে বলা হইল। হরিদাস "প্রাণেশ্বরী! আমি তোমায় গুপ্তসর্পের ন্যায় দংশন করিলাম" বলিয়া প্রেমদার বিষতপ্ত শরীরকে আলিঙ্গন করিল—বিষোত্তপ্ত মুখকে চুম্বন করিল। তখনও সতীতে প্রাণ আছে—সতী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল 'একটু আগে চিনিতাম তো মরিতাম'

না'। একটু থামিয়া আবার কহিল "আশীর্ব্বাদ কর, মাথায় পা দিয়া আশীর্ব্বাদ কর।" বলিতে বলিতে পা যোড়া দিয়া স্বামীর দুপা জড়াইয়া স্বামীর পার উপরে সিঁদুর পরা সিঁথি জড়ান মাথা স্থাপিত করিল। স্থাপিত করিয়া একেবারেই নীরব হইল।

হরিদাস ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অমনি ঘর নরনারীতে পূরিয়া গেল। হরিদাস ও প্রেমদার বিবাহ দুঃখের অশ্রুজলে স্বর্গে ভাসিয়া গেল।

শেষ পরিচ্ছেদ।

শ্মশানের যেস্থানে প্রেমদার স্বর্ণময় দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল; হরিদাস সেই স্থানের উপরে একটী অশোক ও একটী বকুল গাছ রোপণ করিলেন। হরিদাস আর বিবাহ করিলেন না—প্রেমদার সেই স্মৃতি সেই চুল্লিশয্যায় প্রেমদার প্রেমময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখিয়াছিল। হরিদাস প্রত্যহ সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সেই চুল্লির নিকটে গিয়া বসিতেন। বসিয়া কখন কাঁদিতেন, কখন শ্মশানের বন-বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া চুল্লির উপরে পুষ্পরাশি সজ্জীভূত করিতেন। হরিদাসের যত কিছু সুখের সাধ সেই চুল্লির কাছে আসিয়া মিটাইতেন। সেইখানে হরিদাস কখনও তৃণশয্যায় শুইয়া চুল্লীর দিকে এক-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রেমদার সেই গুপ্তদেশে যেন চলিয়া যাইতেন।' সেই শ্মশানে হরিদাস দরিদ্রদিগকে অর্থ বস্ত্রাদি দান করিতেন। প্রতিমাসে পূর্ণিমার রাত্রে চুল্লীর উপরে রাশি রাশি পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি ছড়াইতেন। চুল্লিরোপিত

অশোক ও বকুল বর্দ্ধিত হইলে চুল্লির কাছে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। রাত্রে সেই কুটীরে আসিয়া শয়ন করিতেন—কুটীরে থাকিয়া কেবল ধর্ম্মালোচনা করিতেন। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তকাদি সেই কুটীর ঘরে বসিয়া পাঠ করিতেন।

বকুলের ফুল যখন ফুটিত, তখন সেই ফুলের গন্ধে প্রেমদার গন্ধই অনুভব করিতেন; অশোকের লাল ফুল যখন ফুটিত, তাহাতে প্রেমদার সেই মাথার সিঁদুর ফুটিয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া হরিদাস অশ্রুপাত করিতেন। কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মত্তের ন্যায় সেই অশোক ও বকুলকে আলিঙ্গন করিয়া—গায়ে বুকে মাথা গুঁজিয়া যেন স্ত্রীর শোক কথঞ্চিৎ নিবারিত করিতেন

সুখের বিবাহ।

কোন্নগরে গঙ্গাতীরে একটী বালিকাবিদ্যালয় ছিল। পাঁচ বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালিকারা সেখানে পড়িত।

ঘোষেদের একটী মেয়ে তার নাম সুখ-তারা। বয়স তের বৎসর। দেখিতে যে খুব সুন্দরী—তাহা নহে। তবে রংটা শ্যামবর্ণ হইলেও গড়নটী বড় সুন্দর। চক্ষু দুটী পটল চেরা। কান দুটী ছোট ছোট—সুন্দররূপে গুটান নাকটী টিকেল, অথচ উজ্জল চক্ষুর মধ্যে থাকিবার উপযুক্ত। মাংসল শরীর। রূপ চল চল করিতেছে। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশ যেমন

একটু ফরসা ফরসা বোধ হয়, যৌবনাগমনের পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া সুখতারার সর্ব্বাবয়বের শ্যামবর্ণ একটু ধপধপে—ফরসা ফরসা হইতেছে!

সুখতারা সেই বালিকাবিদ্যালয়ে প্রত্যহ, (কোন দিন ঝির সঙ্গে, কোন দিন বা একেলা) পড়িতে যায়। ৯টার সময় ভাত খাইয়া, পানে ঠোঁট দুটী পাকা তেলাকুচা ফলের মত লাল করিয়া জ্যাকেট গায়ে আঁটিয়া, একখানি পাছাপেড়ে শাটী পরিয়া, শ্লেটের সহিত বই গুলি বগলে ধরিয়া, ধীরে ধীরে পা ফেলিতে ফেলিতে, পথ সুশোভিত করিয়া স্কুলে যাইয়া থাকে। সুখতারা আপনাদিগের বাটী হইতে বাহির হইবার পরে, কিয়দ্দূর গিয়া, পথপার্শ্বস্থ এক ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে যায়; গিয়া কুমুদিনী নাম্নী একটী ১০ বৎসরের বালিকাকে সঙ্গে লয়; তার পরে দুজনে গুটি গুটি স্কুলে যায়।

একদিন ৯টার পর সুখতারা বাটী হইতে কিয়দ্দূর গিয়াছে—হঠাৎ মাথার ফুল কাঁটাটী টুপ্ করিয়া পশ্চাতের দিকে পড়িয়া গেল। সুখতারা জানিতে পারিল না। কিন্তু পিছন হইতে একটী সতর বৎসরের ছাত্র ডান হাতে সেই ফুল কাঁটাটী ধরিয়া, ‘সুখতারা ফুল কাঁটা লও’ বলিয়া যেমনি সুখতারার কবরীতে পরাইয়া দিতে যাইবে, অমনি সুখতারা পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইল। ঘাড় ফিরানর জন্য কাঁটাটী আবার পড়িয়া গেল, ছাত্রটী আবার কুড়াইয়া, যেমনি আবার পরাইয়া দিতে যাইবে, লজ্জাপূর্ণ একটু হাসির রেখায় অধরদ্বয় প্রফুল্ল করিয়া—হাত পাতিয়া বলিল “গোপাল! ফুলকাঁটা দাও।” গোপাল সুখতারার হাতে ফুলকাঁটা দিল। সুখতারার কোমল হাত খানি ছুঁইবা-

মাত্র, কেন তা জানিনা, সুখতারা অবনত মুখে এক ফোঁটা চখের জল ফেলিল, সেই জলের ফোঁটাটী গোপালের হাতের উপর পড়িয়া গেল। গোপাল সে সময়ে কিছু বলিল না—ভাবিল না; তবে সে সময়ে গোপাল আপনার প্রাণে একটু খাঁটি আরাম বোধ করিয়াছিল। ফুল কাঁটাটী হাতে দিয়া, গোপাল চলিয়া গেল। গোপাল যখন পিছনে সুখতারাকে ফেলিয়া যাইতেছিল, সুখতারা একদৃষ্টে অনেক দুর পর্য্যন্ত গোপালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে যখন গোপাল দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল, সুখতারার দুটী চক্ষু স্বল্প অশ্রুস্পর্শে ছল্ ছল্ করিতে থাকিল—সে দিন স্কুল যাইতে ভাল লাগিল না।

সুখতারার ওটা একটী প্রণয় চিহ্ন। কিন্তু প্রণয়ের সূত্রপাত নহে। দুই বৎসর আগে যখন সুখতারাদিগের বাটীতে শ্যামা পূজার রাত্রে বৌমাষ্টারের যাত্রা হয়, তখন গোপাল যাত্রা শুনিবার সময়, সুখতারার কাছে বসিয়াছিল। সেই সময়ে সুখতারা গোপালের মুখখানি, হাসিটুকু, চখের জল পড়াটী, হাতনাড়াটী, কতবার তারিপ করিতে করিতে দেখিতে থাকে। জনতার ভিড় হওয়ায় বালিকার আঁটুটী, বালিকার আঁটুর সহিত লিপ্ত হইয়া যায়, এবং মাঝে মাঝে গোপালের ডান হাতের আঙুল-গুলির সহিত বালিকার বাম হাতের আঙুলগুলির কি প্রকার গুপ্ত আলিঙ্গন হয়। সেই সময়েই সুখতারার হৃদয়টা গোপালের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। সেই রাত্রে গোপাল যাত্রার সভার অন্তস্থানে গিয়া বসিলে বালিকার প্রাণটী বিমর্ষতায় ভারি হয়—যাত্রার মাধুর্য্যে একটু তিক্তরস পড়িয়া যায়। যাত্রার সভায় গোপালের প্রতি সুখতারার প্রণয়-সঞ্চার হয়। এই দুই

বৎসরের মধ্যে গোপালের বালিকার সঙ্গে দেখা শুনা বড় একটী হয় না। বালিকা যে মাঝে মাঝে গোপালকে ভাবিত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সুখতারা শ্লেটে আঁক কসিতে কসিতে গোপালের নাম লিখিত; আপনার পুস্তকের পাতার সাদা জায়-গায় হঠাৎ গোপালের নাম লিখিয়া আবার কালি দিয়া ঢাকা দিয়া রাখিত। কখন কখন গোপালদের বাটীর ধারে. রাস্তায় দাঁড়াইয়া গোপালকে দেখিবার জন্য তাহার পড়িবার ঘরের জানালার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিত। দুই বৎসর পরে সেদিন স্কুলে যাইতে যাইতে, সৌভাগ্যবলে, ফুলকাঁটাটী পড়িয়া যাইতে গোপাল কোথা হইতে স্বয়ং হাতে করিয়া মাথায় ফুল-কাঁটা পরাইয়া দিতে যাইবার সময় ঐরূপ ব্যাপার ঘটে।

সে দিন স্কুলে যাওয়া ভাল না লাগিলেও, অনিচ্ছায় সুখতারা স্কুলে গেল। সে দিন বরাবর অন্যমনস্কা ছিল। পড়া বলিবার সময় মাঝে মাঝে ভুল বলিতে লাগিল—বালিকা আগে একটীও পড়া ভুলিত না। অঙ্ক কসিবার সময় ২এর যায়গায় ৩, ৪এর যায়গায় ৮ পড়িয়া যাইতে থাকিল। সেদিন সুখতারার নামতা পড়াইবার পালা ছিল। পড়াইবার সময় বড় গোলমাল হইল, গুরু মা বকিতে বকিতে বলিলেন, 'হাঁা সুখতারা! আজ তুমি স্কুলে এসে অবধি ক্রমাগত ভুল করিতেছ কেন?' বালিকা একটু লজ্জায় মুখ হেঁট করিল—কোন উত্তর দিল না। নামতা পড়াইবার সময়, তিন দশে চল্লিশ বলিবামাত্র অনেক বালিকা হাসিয়া উঠিল—গুরু মা অবাক হইলেন। তার পর, আবার যখন—আট দশে আটাত্তর বলিল, তখন গুরু মা রাগিয়া সুখতারাকে

পদচ্যুতা করিয়া, আর একটী বালিকাকে সেই পদ দিলেন। সে ঠিক পড়াইতে লাগিল।

গোপাল স্কুলে রোজ যেমন যায়, পড়া বলে, অঙ্ক কসে, তেমনই সবই করিল। স্কুল হইতে বাটী আসিল। তার পর সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ঘাটে গিয়া বসিল। বসিয়া নৌকা দেখিতেছে, হিল্লোলের খেলা দেখিতেছে—আর মাঝে মাঝে কত কি ভাবিতেছে। মানুষের মন স্থির থাকিতে পারে না—ভাবের স্রোত মনে সর্ব্বদাই বহিয়া থাকে। গোপাল গঙ্গার ওপারের গাছ পালা, তেজোহীন সূর্য্য, জলের রঙ্গভঙ্গ, মাঝিদের দাঁড় টানা প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে একটু একটু অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল—কি ভাবিল ?—ভাবিল আকাশ, তারা, সরোবর, জল, মাছ, মাছরাঙা পাখী, চিল, আবার সরোবর, জল, কমল ফুল, তার পরই ফুল কাঁটা—এইখানে চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া গোপাল আটকাইয়া পড়িল। সেই ফুলকাঁটা ভাবিবার পরই, ভাবিল,—সেই কবরী—সেই মুখ—সেই চোখ—তার পরেই হাতের উপর সুখতারার অশ্রুজলের ফোঁটা। গোপালের প্রাণটা এই থমকিয়া দাঁড়াইল—সেই থানে কথাগুলা বরাবর ভাবিতে লাগিল—আলোচনা করিতে থাকিল—হাড়ে মাসে রক্তে জড়াইয়া অমৃতস্পর্শে সিহরিতে থাকিল। ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়টা সেই দিকেই ঝুঁকিতে লাগিল। গোপাল যত ভাবে, ততই মিষ্টতা পায়। গোপাল বিশেষরূপে এই ভাবিল, ফুলকাঁটা দেবার সময় আমার হাতে তার অশ্রু-জলের ফোঁটাটী উত্তপ্তভাবে কেন পড়িয়া গেল ? আমি তো জোরে হাতের উপরে ফুলকাঁটাটী পরাইয়া দি নাই যে,

লাগিবার দরুণ যাতনায় কাঁদিয়াছে? তবে কাঁদিল কেন? গোপাল খানিক ভাবিয়া ঘরে গেল—রাত্রে প্রদীপ লইয়া রীতিমত পড়িতে থাকিল। ওসব আর ভাবিল না।

পরদিন স্কুলে যাইবার সময়, বালিকা পথে বড় আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল—কি ভাবিতে থাকিল—বোধ হয় ভাবিতেছিল, আবার ফুলকাঁটা পড়িয়া যাউক, গোপাল আবার সেইরূপ করুক। বালিকা যাইতে যাইতে পিছনের দিকে তাকাইতে লাগিল। খানিকদূর গিয়াই একটা পয়সা হারাইবার ভান করিয়া রাস্তার দুই পাশের ঘাসবনে খুঁজিতে লাগিল। এমন সময়ে গোপাল মধুর বেশে সেইখানে পুস্তক হাতে লইয়া স্কুলের সাজে উপস্থিত হইল। যেন ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয় হইল। বালিকার বুকটী একটু গুর্ গুর্ করিল; রক্তস্রোত একটু জোরে চলিতে লাগিল। বালিকা যুবার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল। যুবা বালিকাকে দেখিবামাত্র একটী ভাবের তোড়ে আক্রান্ত হইল—হৃদয়টা কেমন একটা যেন গোলমেলে ধরণে চঞ্চল হইল—যুবা সতৃষ্ণনয়নে বালিকাকে আপাদমস্তক দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। একটী মেঘের ভিতর হইতে আর একটী মেঘে যেমন বিদ্যুৎ প্রবেশ করে, সেইরূপ একটী কি যেন এক জনের বুক ভাঙ্গিয়া অপরের বুকের ভিতর প্রবেশ করিল। যুবা বালিকাকে পথে রাখিয়া চলিয়া গেল। বালিকা একদৃষ্টে যুবাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। যুবা বালিকাকে অগ্রসর হইবার পরে, একবার ব্যাকুল ভাবে পিছনের দিকে তাকাইবামাত্র দেখিল, বালিকার দুচক্ষু অশ্রুজলে টলটল করিতেছে—ম্লানভাব মুখের দীপ্তিতে মিশ্রিত রহিয়াছে। বালিকার

ম্লানমুখে অশ্রুভার দেখিবামাত্র যুবকের হৃদয়ের তলদেশ হইতে একটী উদ্বেগ উঠিল—প্রাণটা বড় খারাপ হইল—চলনের বেগকে কমাইয়া, আবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল, বালিকা আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অতি ধীরে ধীরে আসিতেছে। সে দিন যুবার স্কুল যাইতে ভাল লাগে নাই।

২।

সুখতারা গোপালদের বাটীতে বেড়াইতে যাইত। এবার ঘন ঘন যাইতে লাগিল। একদিন গোপাল পড়িবার ঘরের চৌকাটে বসিয়া কি ভাবিতেছে, এমন সময়ে (তখন সেখানে কেহ ছিল না) সুখতারা সেইখানে গোপালকে একটী ছোট ছেলের দ্বারা একখানি পত্র পাঠাইয়া দিল। গোপাল পত্রখানি লইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া পড়িল।

গোপাল !

আমি তোমার কাছে যাইয়া সব বলিব ভাবিয়াছিলাম—লজ্জায় পারিলাম না। তুমি আমায় একটী কথা বলিবে কি না ? তুমি কাকে বিবাহ করিবে ?

পত্রে আর কিছু লেখা নাই। নিম্নে কাহারও স্বাক্ষর নাই। পত্র পড়িয়াই গোপাল বুঝিল, ইহা সুখতারার পত্র। গোপাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া উত্তর লিখিল :—

"তুমি কে জানিতে পারিলাম না। বোধ হয় বিবাহ করিব না। যদি সুখতারা বিবাহ করে, তো তাকেই বিবাহ করিব—কারণ সে আমার অনেক দিন হইল প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে"।

গোপাল আপনার একটী পাঁচ বৎসরের ছোট ভগিনী দ্বারা এই পত্রখানি সুখতারার কাছে পাঠাইল। সুখতারা একবার

পড়িল। তার পর এক লাইনের এক একটী কথা ৩৪ বার করিয়া পড়িতে লাগিল। যেন অক্ষরগুলি খাইতে থাকিল; যেন প্রাণটা সেই পত্রশয্যায় পড়িয়া বারবার গড়াগড়ি দিতে থাকিল। পত্রখানি একবার একবার পড়িতেছে আর পিছনের দিকে দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কিনা। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই পত্রখানি গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিল। অবসরে নিরিবিলি দেখিয়া মাঝে মাঝে—পড়িতে ছাড়িল না—জগতে তেমন মধুর লেখা বালিকা কখন পড়ে নাই। একটী কথা মাঝে মাঝে বালিকার স্মৃতিকে বড় উন্মত্ত করিয়া, অধরে হাসির রেখা ফুটাইয়াছিল। সেটী সেই পত্রের "যদি সুখতারা বিবাহ করে তো—বিবাহ করিব" এই কথা। সে ভাবটী প্রাণে সর্ব্বদাই বিহার করিতে লাগিল—সে কথাটী ভাবিতে ভাবিতে বালিকা কখন মুচকিয়া হাসে—আহ্লাদে আটখানা হয়—আবার নৈরাশ্যের ভারে মলিনমুখী হইয়া—এক একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে।

৩।

দুজনের ভিতরের কথা আর কেহ জানিল না। জানিল কেবল ঈশ্বর। বালিকা প্রত্যহ বাটীর শ্রীধরের কাছে প্রণাম করিবার সময় ব্যাকুলভাবে গোপালের ভালর জন্য প্রার্থনা করিত।

বালিকার বাপ, মা, ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা, ভাই, ভগিনী, খুড়া, জ্যাঠা সবই ছিল। বড় মানুষের ঝি। তবে পিতা বড় ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল, ঠাকুর দাদাও ইংরাজী ভাবের ভক্ত ছিল। সুতরাং সুখতারার বিবাহে বিলম্ব হইতে লাগিল। পিতা

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দিবে না। সমাজের অন্যান্য মেয়ে অপেক্ষা সুখতারা একটু স্বাধীনতা পাইয়াছিল—তার প্রমাণ তের বৎসরের মেয়ে প্রায়ই একলা স্কুলে যাইত—কোন কোন দিন "স্কুলের ঝি" সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত।

সুখতারা তের বৎসরের যখন, তখনও স্কুলে পড়িত -চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র বিবাহের সম্বন্ধ চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সুখতারার বিবাহ দেওয়া স্থির করিল। এই সময়ে সুখতারার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল।

৪।

যে দিন সুখতারার বিবাহ হইবেক, সেই দিন সুখতারা বড় কাঁদিতে লাগিল। সে কান্না কিছুতেই থামে না। সুখতারা একটী কথা গুরুজনদিগকে ফুটিয়া বলিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল—কিন্তু সেটী বলা আর খুন করা যেন তুল্য বলিয়া বোধ হইল। সুখতারা ভাবিতে লাগিল, এখন উপায় কি? কাকে একথা বলিব? কি প্রকারে বলিব? না—বলিব না—যা হয় হউক। আবার ভাবিল, কি? গোপালকে ছাড়িয়া আমি আবার কাকে স্বামী বলিব? তাকি হয়? আমি বিষ খাইয়া মরিব ভাল—তবু গোপাল ছাড়া আর কাকেও স্বামী বলিয়া ডাকিতে পারিব না। এখনি ঠাকুর মাকে খুলিয়া বলিগে। লোকে নিন্দা করিবে? জ্যাঠা মেয়ে বলিবে? তা ব'লে বলুক; আমার গোপাল বড় না নিন্দাভয় বড়? আমি গোপালের জন্য যখন মরিতে পারি, চিরকাল আইবুড় থাকিতে পারি, তখন আবার নিন্দার ভয় করিব কেন? আমি যাই—ঠাকুর মাকে খুলিয়া বলিগে।" আবার ভাবিল, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারির,

কারও দ্বারা বলাই।” আবার ভাবিল—কার দ্বারা বলাইব? সে যদি না বলিয়া—বলে, “বলিয়াছি” তা হ’লেই তো সর্ব্বনাশ! তবে কি করিব? ঠাকুর মাকে পত্র লিখিয়া জানাই। এই ভাবিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া পত্র লিখিতে লাগিল। কলম হাতে করিয়া কাগজ পাতিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিল। পথের সেই ফুলকাটা পড়ার কথা, গোপালের সেই সজল নয়নে ফিরিয়া দেখার কথা, গোপালের সেই পত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে বালিকা আকুল প্রাণে কাঁদিয়া পত্র লিখিবার কাগজ ভাসাইতে লাগিল। বড় বড় অশ্রুজলের ফোটা টপ্ টপ্ করিয়া সেই কাগজে পড়িয়া কাগজ খানাকে আর্দ্র করিয়া ফেলিল। সুখতারা কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল :—

ঠাকুর মা!

লিখিয়াই আসল কথা লিখিবার সময় হাত কাঁপিতে লাগিল, হৃদয়োচ্ছ্বাসে বুক কাঁপিতে থাকিল। লেখাটী কম্পিতা লেখনীতে আরম্ভ করায়, এঁ্যাকা ব্যাঁকা হইতে থাকিল; লেখার উপরে মাঝে মাঝে চখের জলের ফোটা পড়িতে লাগিল—দুই একটী অক্ষর সে জলের ফোঁটায় অর্দ্ধবিগলিত হইয়া গেল। মনকে স্থির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে পারিল না। যত রাত্রি নিকটে আসিতে লাগিল, বেলা বাড়িতে থাকিল, ততই যেন, বালিকার অন্তিমকাল—যম-সদন-সন্নিকট-প্রায় বোধ হইতে লাগিল। ঘরের ভিতরে বসিয়া ২ ঘণ্টা পত্র লিখিতে চেষ্টা করায় ৪।৫ খানা কাগজ অশ্রুজলে, কম্পিত লেখনীর উৎপাতে, নষ্ট করিয়া, অনেক কষ্টে লেখাটী সম্পন্ন করিল। যেন একটী দায়ে উদ্ধার পাইল। সে পত্রখানি এই :—

ঠাকুর মা!

আজ আমার বিবাহ। তোমাদের বড় আনন্দ। আমার মনে বড় দুঃখ—কষ্ট—যাতনা। আজ আমার বিবাহের আয়োজন-স্থলে যদি শ্মশানে যাইবার আয়োজন করিতে তো, আমার আমোদ হইত। যদি আমার আজ বিবাহ দাও তো বিষ খাইয়া মরিব। যদি আমায় বিবাহ দিয়া সুখী কর, তো মিত্রদের গোপালের সঙ্গে আমার বিবাহ দাও। যদি না দাও তো আমাকে কাল আর দেখিতে পাইবে না।' ইতি—

সুখতারা।

সুখতারা পত্র খানি লিখিয়া পেটকাপড়ে রাখিল। ঠাকুর মার কাছে পত্র দিবার জন্য ৪।৫ বার আনাগোনা করিল; কিন্তু দিবার সময় লজ্জা আসিয়া বাধা দিতে লাগিল। ক্রমশঃ দিন ফুরাইতেছে—সুখতারার দুঃখ বাড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল—তখনও "দি" "দি" করিয়া বালিকা পত্র দিতে পারে নাই। পত্রখানা ঠাকুর মাকে দিবার জন্য বালিকা ছট্ ফট্ করিতে থাকিল; কিন্তু লজ্জায় সব মাটী হইতে লাগিল। অনেক যত্নে গোপনে মনটাকে পত্র দিবার জন্য প্রস্তুত করে; কিন্তু ঠাকুর মার কাছে গিয়া, হয় তো দেখে, ঠাকুর মা কাজে ব্যস্ত, না হয়, কাহারও সহিত আলাপে নিযুক্ত; তাহা দেখিয়া মনটা মুচড়াইয়া যায়—দিতে গিয়াও দিতে পারে না।

সন্ধ্যার পরেই মহা সমারোহে বর আসিল। বাজী পুড়িল—বাজনা বাজিতে লাগিল। বাড়ীতে লোকের ভিড় হইল—বাড়ী আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। বর সভা আলো করিয়া বসিল। বিবাহ সভা, ফুল আতর গোলাপের গন্ধে ভরিয়া গেল।

নানা কথা, আলাপ, জিজ্ঞাসা পড়ার, হুড়াহুড়ি পড়িল। সুখতারা সেই সময়ে আপনার বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিল "ঈশ্বর আমায় বিপদে রক্ষা কর।" কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্‌কে ডাকিবামাত্র, একটী নূতন তেজ তার প্রকৃতির গুপ্তস্থান হইতে উঠিয়া, হৃদয় প্রাণে মহা তেজের—মহা সাহসের আগুণ জ্বালিয়া দিল—বালিকাকে অভিভূতা করিল—তার বিকৃতলজ্জাকে পুড়াইয়া—সৎসাহসে সবলা করিল। যেন আর একটী লোক—মহাবলে সুখতারার কথাটী জানাইবার জন্য সুখতারাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, তাহার অস্তিত্বে বসিয়া, সেই বিপদে পত্রখানা দিবার ভার গ্রহণ করিল। সেরূপ তেজ সুখতারা কখন অনুভব করে নাই। সেটী নৈতিক তেজের স্ফূরণ, কি দেব-শক্তির আবির্ভাব, তা ঠিক বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সে দুর্লভ সামগ্রীটী এ বঙ্গদেশে—ভারতবর্ষে—আর বাস করে না—এক সময়ে সাবিত্রী, দময়ন্তী, পদ্মিনী প্রভৃতি সতীদিগের প্রাণের অন্দর মহলে বাস করিয়াছিল, এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া, সে দেশকে স্বর্গের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। নীতি-দর্শনে ইহাকে নৈতিক সাহস কহে। এই জিনিসটী যখন বালিকার প্রাণে ভাবের মহা তুফান লইয়া আসিয়াছিল—তখন বালিকার মুখের রং বদলাইয়াছিল, দৃষ্টি পাপভেদী হইয়াছিল—সর্ব্বাবয়বে একটী প্রখরা দীপ্তি ফুটিয়াছিল। সুখতারা, বিবাহের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই সাহস বুকে ধরিয়া—ভাবে ফুলিতে ফুলিতে—আরক্তনয়নে—কম্পিত দেহে—ঠাকুর মার কাছে গেল। সেখানে আরও অনেক লোক ছিল দেখিয়া, ঠাকুর মাকে আঁচল ধরিয়া আকর্ষণ করিল—ঠাকুর

মার তখন প্রাণটী যেন কেমন হইয়া গেল; কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন প্রাণে পিছনে পিছনে যাইল—একটী ঘরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা দেখিল, নাতিনীর চেহারাটী পাগলিনীর মত। ঘরে গিয়া নাতিনী ঠাকুর মার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল—কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর মার গলা জড়াইয়া, গলায় কাছে মুখ গুঁজিল—গুঁজিয়া অজস্রধারে উত্তপ্ত অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। দেখিয়া ঠাকুর মার আত্মাপক্ষী উড়িয়া গেল। ঠাকুর মা কাঁদ কাঁদ ভাবে ভীত স্বরে জিজ্ঞাসিল "আজ শুভদিনে কান্না কেন? হয়েছে কি?"

বালিকা তখন মুখ তুলিয়া বলিল, "আমাকে তোমরা মেরে ফ্যাল।" বলিয়াই পাগলিনীর মত ঠাকুর মার মুখের দিকে সজল অগ্নিপূর্ণ নেত্রে তাকাইয়া থাকিল।

ঠাকুর মা অবাক হইয়া আবার জিজ্ঞাসিল, 'ওকি? আজকের দিনে ওকি?'

বা। কেন? আজ আমার কি?

ঠাকুর মা। সে কিলো! আজ তোর বিয়ে, অমন সব করা কি ভাল!

বালিকা তখন উন্মাদিনীর মত বলিল "আমার বিয়ে না শ্রাদ্ধ! আমি ওকে বিয়ে করবো না! আমি বিষ খাব সেও ভাল, তবু আজ ওকে বিয়ে করবো না—যা ঠাকুর দাদাকে ব'লগে যা! এই আমার চিঠি লয়ে ঠাকুর দাদাকে শোনাগে যা! বাবাকে মাকে শোনাগে যা! আমি এই বার বিষ খেয়ে মরিগে।" বলিয়াই বালিকা সেই খানে বসিয়া পড়িল—সমুদয় পৃথিবীটী যেন ঘুরিতেছে বোধ হইল—যমযাতনা অনুভব

করিতে লাগিল। বৃদ্ধা ঠাকুর মা সুখতারার ভাবভক্তি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকটে গেল—চিঠি দেখাইল, তার পর ছেলে বউ মেয়ে সকলকে চুপে চুপে বলিল। সকলে শুনিয়া অবাক হইল। সুখতারার পিতা ব্রহ্মজ্ঞানি মানুষ। মেয়ের এই কথা শুনিয়াই পিতাকে বলিল 'বাবা! আমার মেয়ের সুখের জন্য বিবাহ, যদি এতে তার অসুখই বাড়ে তো বিবাহ দিবার প্রয়োজন কি?' পরিশেষে বাটীর সকলের, সে পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ায় অমত হইল। কথাটী থপ্ করিয়া চারিদিকে ছড়াইতে থাকিল। একটী গোলমাল উঠিল। এখন কে গিয়া বলিবে যে "বর উঠিয়া যাউক, বিবাহ হবে না।" সেখানে কন্যা পক্ষীয় পুরোহিত, বর পক্ষীয় পুরোহিতকে সমুদয় ব্যাপার কহিল। বরকর্ত্তা শুনিল—বর শুনিল। হৈ হৈ শব্দ উঠিল—গালাগালি মারামারির উপক্রম হইল—হঠাৎ এক ডজন পুলিষের লোক আসিবামাত্র সব গোলযোগ চুকিল। বরকর্ত্তা বরযাত্রী গালাগালি দিতে দিতে, কেহ শেয়াল ডাকিতে ডাকিতে—কুকুর ডাকিতে ডাকিতে—শালা প্রভৃতি ভাষায় গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ভিড় কমিলে, সুখতারার পিতা গোপালের পিতার নিকটে গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিল, 'আমার জাত রাখিতে হইবে—তোমার গোপালকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিব।' গোপালের পিতা মাতা সকলে রাজি হইল।

গোপাল তখন আপনার মনোক্লেশে বিছানায় ছট্ ফট করিতেছিল। হঠাৎ আপনার বাটীর ভিতরে শাঁখ বাজিতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। তার পরে গোপালের পিতা গিয়া

বলিল, 'বাবা, একটু ওঠ—আজ তোমার শুভ বিবাহ'। গোপাল শুনিয়াই চমকিত ও পুলকিত হইল। মনে মনে ভাবিল—এ আবার কি? আমার বিবাহ কোথা? গোপাল এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে গোপালের প্রিয় বন্ধু নেপাল, গোপালকে শুভ সংবাদ দিতে আসিল। সে আসিবামাত্র গোপালের মনে যেন একটী কিসের আশা জাগিল। গোপালের পিতা তখন গোপালকে বর সাজাইবার জন্য অন্যত্র ব্যস্ত আছে। নেপাল ডাকিল—গোপাল উঠিয়া গেল। নেপাল বলিল 'সুখতারার সঙ্গে তোর এখনি বিবাহ হবে।' শুনিবামাত্র আনন্দে গোপাল কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁপিতে লাগিল। তার পর, কিয়ৎক্ষণ পরে গোপাল বর সাজিয়া সুখতারাকে বিবাহ করিতে যাত্রা করিল। শুভ বিবাহ মহাসুখে সম্পন্ন হইল। সুখতারা তার পর, মহা-সুখে—গভীর প্রণয়ে—পৃথিবীতে স্বর্গ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

আদর্শ বালবিধবা।

[আমার কোন আত্মীয়া ভগিনীর জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইল। "অতুল দিদির" স্বর্গীয় চিত্র নষ্ট হইবার নহে। অনেক ফুল বনে ফুটে, বনে গন্ধ দেয়, বনেই বিলীন হয়। "অতুল দিদির" মত কত ললনা হিন্দুর অন্তঃপুরে ফুটিয়া বিলীন হইতেছে। আমার 'অবলা-বালা'র অতুল দিদির মূর্ত্তিই আঁকিতে যত্ন করিয়াছি। এ চিত্রটী তাঁর জীবনের আর একটী অবস্থা মাত্র। শেষের পবিত্র উক্তিগুলি তাঁরই মুখের কথা।]

অতুল সুন্দরী, বালিকাবয়স হইতেই বড় ধীর, বড় শান্ত।

কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে জানিত না। কেহ যদি একটু তিরস্কার কখনও করিত, তিরস্কার শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিত—কখনও কোন কথার প্রত্যুত্তর করিত না।

অতুলের বার বৎসরের সময় বিবাহ হইল। অমন সুন্দর গুণবান্ বর সে গ্রামে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। অতুল আপনি রূপে গুণে সকলের প্রাণ আলো করিয়াছিল—অতুলের স্বামীও তদ্রূপ হওয়ায়, অতুলের মা, বাপ, খুড়া, খুড়ি সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

বিবাহের পর অতুল শ্বশুর বাড়ী গিয়া সর্ব্বদা ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া থাকিত—সে ঘোম্‌টা বাপের বাড়ীতেও দেখা দিল। বাপের বাড়ীতে দাদা, খুড়া প্রভৃতি গুরুজনকে দেখিলেই ঘোম্‌টা দেয়;—তবে এ ঘোম্‌টা শ্বশুর বাড়ীর মত তত বড় নহে। বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী আসিলে বাপের বাড়ীর হাওয়ায় ঘোম্‌টাটা অনেকেরই উড়িয়া যায়;—কিন্তু অতুলের ঘোম্‌টা একবারে যায় না—খানিকটা থাকিল।

মা, পিসী, খুড়ি প্রভৃতি সকলে বলিলেন, "অতুল! ও কি মা? বাপের বাড়ীতে ঘোম্‌টা কেন মা? অতুল মুখ হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "তাতে দোষ কি মা?"

অতুল আগে বড় ভাইদের সঙ্গে কথা কহিত—এখন কেমন লজ্জা হইতে লাগিল। বড় দাদা অতুলের কাছে দাঁড়াইল; অতুল অমনি লজ্জায় জড়সড় হইয়া—আধ ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

দাদা অতুলের রকম দেখিয়া বিস্মিত হইল—বলিল, "ও অতুল! ও কি? আমায় দেখে তোর ঘোম্‌টা কেন?"

অতুল মুখ হেঁট করিয়া একটু লজ্জাজড়িত মৃদু হাসি হাসিল মাত্র। অতুলের দাদা "ভাল শ্বশুর বাড়ি থেকে একটা নূতন ঘোমটা দেওয়া শিখে এসেছে" বলিয়া চলিয়া গেল।

অতুলের এক খুড়তুতো বোন অতুলকে ডাকিল। সে অতুল অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড়। সে অতুলকে ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসিল "হ্যাল্যা! এ আবার কি? বাপের বাড়িতে ঘোমটা দেওয়া কি? দাদাকে দেখে, বাবাকে দেখে, কাকাকে দেখে ঘোমটা দেওয়া কি?"

অতুল বলিল "আমার দিদি বড় লজ্জা করে?"

অপর—কেন? কেন লজ্জা করে?

অ—তা জানি না। বলিয়াই অতুল একটু হাসিতে হাসিতে দিদির মুখের দিকে চাহিল।

অপরা—কি বলিস বুঝতে পারি না। দাদাকে দেখে লজ্জা কিসের?

অ—'কেন বলবো'—বলিয়াই অতুল দিদির কানের কাছে মুখ সরাইয়া চুপে চুপে কহিল "তোমার ভগ্নিপতির সঙ্গে যে দাদার বড় আলাপ হয়েছে।"

বলিতে বলিতে ভয়ে লজ্জায় অতুলের মুখ চোখ ঠোঁট লাল হইয়া উঠিল—কথা গলায় জড়াইয়া আসিল;—কারণ দিদির কাছে স্বামীর উল্লেখ মহা লজ্জার কথা!

অতুলের বয়স যখন পনের বৎসর হইল, তখন শ্বশুর ঘর করিয়া বাপের বাড়ি আসিল। বাড়ির সমবয়স্কা বন্ধুগণ, দুচার বৎসরের বড় ভাজ সকল অতুলের কাছে তার শ্বশুর বাড়ির কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অতুল আর সব কথারই উত্তর

দেয়, কিন্তু স্বামীর কথা কেহ কহিলে অমনি লজ্জাবতী লতার মত যেন জড়াইয়া যায়—মুখ চোখ—লাল হইয়া উঠে।

এক দিন সন্ধ্যার সময়, বাটীর ছাদের উপরে, গ্রীষ্মের ফুর্‌-ফুরে বাতাসে বসিয়া অতুলকে অতুলের একবয়স্কা ভগিনী জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! জামাই বাবু তোকে কেমন ভাল বাসে" অতুল অমনি মুখ হেঁট করিল—লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। অতুল কথার কোন উত্তর করিতে পারিল না।

একবয়স্কা—"ও আবার তোর কি রকম ধরণ বল দেখি! স্বামীর কথায় মনে আনন্দ হয় না। সমবয়সীর কাছে স্বামীর কথা ক'য়ে আমাদের প্রাণ খালি হয়—সবাই কয়। তোর তাতে লজ্জা কি? আমার মাথা খাবি—বল বল্‌ছি।"

অতুল একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, 'তা কি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়? তাকি বুঝ্‌তে পার নাই'?

একবয়স্কা—তা বুঝেছি। ভগ্নিপতি আমার তোকে খুব ভাল বাসে। তা—না বাসবেই বা কেন, এমন সুন্দরী মাগ—তাতে এত গুণ—বলিতে বলিতে অতুলের গালটী টিপিয়া ধরিল। অতুল অমনি ব্যস্ত হইয়া বয়স্কার হাতটী আপনার মুখের উপর হইতে সরাইয়া বলিল "ওকি ভাই! আর কি কোন কথা নাই।"

অতুল স্বামীর কথা মনে লুকাইয়া রাখিতে ভালবাসে। সে ফুলের গন্ধ ফুলের পাপড়ির ভিতরে ঢাকা থাকিলেই ভাল। হাওয়ায় ছাড়িয়া দিলে গন্ধ কমিয়া যাইবে—অতুল সুন্দরীর প্রাণের ভাব সেই প্রকার। গাঢ় প্রণয়ের ধর্ম্মই এইরূপ।

অতুলের স্বামী একখানা পত্র অতুলকে লিখিয়াছিল। পত্র-

খানা অতুলের এক ছোট ভাই 'এই জামাইবাবুর পত্র নে' বলিয়া দিদির হাতে দিল; অতুলের প্রাণ তখন লজ্জায় চমকিয়া উঠিল—পত্রখানা অতুলের হাত হইতে ভূতলে পতিত হইল। অতুল সে পত্রের দিকে তাকাইল না—দ্রুত কার্য্যচ্ছলে অন্যত্র চলিয়া গেল। তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। ছোট ভাই বাড়ী হইতে সরিয়া গেলে—অতুল দ্রুত সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল —চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কেহ আছে কি না;—যখন দেখিল, সেই পত্রখানা ব্যতীত সেখানে আর কেহ নাই—তখন পত্রখানা গ্রহণ করিয়া পেটকাপড়ে লুকাইল—তার পর দ্রুত গিয়া বাক্সের ভিতরে রাখিল। বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

অতুলের পত্র পড়া আর হয় না। কখন পড়িবে—পড়িবার সুবিধা পায় না। ২ দিন পরে দুপুর বেলা যখন বাড়ীর সকলে নিদ্রিত, তখন অতুল চুপে চুপে চোরের মত সেই বাক্সটী একটী ঘরে লইয়া গেল। ঘরে খিল দিল। তারপর বাক্স খুলিয়া পত্র বাহির করিল। পত্রখানা এপর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। পত্রখানার উপরে পাঠ করিলঃ—

শ্রীমতী অতুলসুন্দরী বসু।

স্বামীর হাতের লেখা—যেন হরপে হরপে মুক্ত ঝক্‌মক্ করিতেছে। স্বামীর হাতের লেখা দেখিয়া অতুলের মুখ চোখ আনন্দে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু ভয় হইতেছে পাছে ঘরের দ্বারে কেহ ধাক্কা মারে অথবা কেহ আড়ি পাতিয়া দেখে। অতুল এক একবার দ্বারের কাছে টিপি টিপি আসিয়া কান পাতিয়া দেখে কেহ উকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছে কি না—তার পর

আস্তে আস্তে পত্রখানির কাছে গিয়া বসে। অতুল সাহসে ভর দিয়া পত্র খানি খুলিল। পত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। লজ্জায় ভয়ে বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছে (পাছে কেহ জানিতে পারে!) আবার তাহারই উপরে আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে। পত্র খানা পড়িতে পড়িতে অতুলের চোখে জল আসিল। স্বামীকে দেখিবার জন্য প্রাণটা ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অতুল পত্র খানা পড়িয়া তাড়াতাড়ি (ঐ বুঝি কেউ এল!) বাক্সের মধ্যে রাখিল। তার পর চোখের জল ভাল করিয়া মুছিয়া, মুখ খানা প্রফুল্ল করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

স্বামী পত্রের জবাব চাহিয়াছেন—অতুলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িয়াছে। অতুল কি প্রকারে বাপের বাড়িতে বসিয়া, বাপ, ভাই, মা, খুড়া, খুড়ি প্রভৃতির বাতাসের মধ্যে থাকিয়া কি প্রকারে স্বামীকে পত্র লিখিবে। অতুল সর্ব্বদা তাহা ভাবে আর লজ্জায় কেমন হইয়া যায়। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল "নিজেতো কখন লিখিতে পারিব না! ছ্যা! ছ্যা! যদি দাদা জানিতে পারেন! কি কাকা দেখিয়া ফেলেন! কি বাবারই হাতে চিঠি খানা গিয়া পড়ে! কি শ্বশুর বাড়িতে যদি ভাসুরের হাতে আমার হাতের লেখা গিয়া পড়ে!!" অতুল ভাবিতে ভাবিতে জিভ কাটিল—ছি। ছি! ছি! ছি! স্বামীর কানে কানে কথা বলি, সে কেহ জানিতে পারে না। আর চিঠি লেখা! বাপের বাড়ি হতে স্বামীকে চিঠি লেখা! ছি! ছি! ছি! অত বেহায়া হতে আমি পারবো না! তাঁরা বেটা ছেলে, তাঁরা লিখেছেন বলে কি আমাকেও লিখ্‌তে হবে! ছি! ছি! গলায় দড়ি দিয়ে মরিগে না কেন!!

আবার ভাবিল ;—তা অনেকে তো লেখে ? ছোট দিদি এই যে মাসে মাসে লেখে। ছি! ছি! ছোট দিদি কি বেহায়া। তা আমি ম'রে গেলেও লিখ্‌তে পারবো না।

অতুল স্বামীর পত্রের উত্তর দিতে পারিল না। দুই মাস পরে স্বামী আসিল। স্বামীকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল "আমার মাথা খাও, আমায় তুমি অত বেহায়া কর্‌না। আমার নামে যদি আর কখনও পত্র লেখ তো লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারবোনা।" কথা শুনিয়া স্বামী খানিকটা হাসিলেন—স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন "তাতে লজ্জা কি ?

অতুল স্বামীর দু হাত মাথার উপরে রাখিয়া বলিল—না আমার মাথা ছুঁয়ে বল—আর আমায় লজ্জায় ফেল্‌বে না।

স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে গো তাই হবে। কাকে তবে লিখবো ?"

অ। কেন দাদাদের পত্র লিখবে, তাতেই আমি তোমার খবর শুন্‌বো।

স্বামী। তাতে লজ্জা হবে না।

অতুল একটু হাসিয়া বলিল—না—তাতে লজ্জা হবে কেন ?

স্বামী পরদিন চলিয়া গেলেন।

কিন্তু অতুলের পৃথিবীর সুখ অধিক দিন থাকিল না। ভগবান্ অতুলের স্বামীসুখ অধিক দিন রাখিলেন না। কয়েক মাস পরে সংবাদ আসিল, অতুলের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। প্রথমে অতুলের বাপ সংবাদটা চাপিয়া রাখিয়াছিল। একমাস পরে ঘাট কামানের দিন, সকালে অতুলের পিতা প্রাণের দুঃখবেগ প্রাণে চাপিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে বাধ্য হইলেন যে, "অতুলের

কপালে যা ছিল, তা হয়েছে, এখন নাপ্‌তে এসেছে কামাতে বল।” কথাটী কেউটে সাপের মত অতুলের মাকে দংশন করিল। অতুলের মা কাঁপিতে কাঁপিতে “আমার অতুলের কি সর্ব্বনাশ হলো গো” বলিয়া দড়াম করিয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সেই কাল সর্প একে একে বাড়ীর সর্কলকে দংশন করিল। বাড়ীতে শোকের মহা তুফান উঠিল। অতুল সর্প-দংশন সহ্য করিল—কাঁদিল না—চুপ করিয়া থাকিল। অতুলের মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের রং দেখা গেল মাত্র—হঠাৎ সোণার রংটা যেন মলিন হইয়া গেল—আর কিছু চিহ্ন দেখা গেল না। অতুল একটী দীর্ঘশ্বাসও ফেলিল না। কেবল এক একবার আকাশের দেবতাদিগের উপরে যেন দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল—অতুল আদতে কিন্তু কাঁদিল না। অতুল সেই ভাবে তৎক্ষণাৎ হাতের লোহা খুলিল—বালা খুলিল—সমুদয় গহনা খুলিল—মাথার সিন্দূর মুছিল—পরিধানবস্ত্রের পাড়গুলা পড় পড় করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তার পর কামাইবার পর—স্নানাদি করিয়া এলোচুলে গৃহদেবতার সম্মুখে গম্ভীর মূর্ত্তিতে মুদিতনেত্রে বসিয়া আপনার স্বামীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল। স্বামীমূর্ত্তি চিন্তা করিবামাত্র অতুলের মূর্চ্ছা হইল।

জামাতার শোক কয়েকদিন পরে একটু কমিয়া আসিলে, অতুলের মা অতুলের দিকে একবার পাগলিনীর মত চাহিয়া দেখিল। দেখিল, অতুলের হাতে বালা নাই, লোহা নাই, মাথায় সিন্দূর নাই, অতুল থান কাপড় পরিয়া আছে। মার বুকটা ভাঙ্গিয়া গেল। মা অতুলকে বালা পরিতে বলিল। পেড়ে কাপড় পরিতে বলিল। অতুল সে কথাগুলা শুনিয়া বড় ব্যাকুল

হইল। অতুলের ভাল বালা আনিয়া অতুলকে পরিতে বলিল—পীড়াপীড়ি করিল, যেদাযেদি করিল—কান্নাকাটি করিল। অতুল তখন কাঁদিতে লাগিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "যদি আমায় যমের বাড়ী পাঠাতে চাও, তো ও গুলো আবার পরিয়ে দাও।"

অতুল কিছুতেই পরিবে না, উহারাও ছাড়িবে না। এক দিন, অতুল ভাবে বিভোর হইয়া বলিল "ও গহনাগুলা হাতে না থাকিলে আমার সর্ব্বদা সেই মহাপুরুষকে মনে পড়ে। হাতের দিকে—থান কাপড়ের দিকে চাহিলেই তাঁকে স্বর্গে দেখিতে পাই। আমার জীবন এখন দেবভাবে পূর্ণ করিব, না ও সব কলঙ্ক পরিয়া, সংসারের ভাবে আচ্ছন্ন থাকিব। তিনি যতদিন সংসারে মানুষ ছিলেন, আমিও ততদিন মানুষ ছিলাম। তিনি এখন স্বর্গে গিয়া দেবতা হইয়াছেন—আমি এখন দেবতার দাসী হইয়াছি। আমি এখন দেবসেবা করিব—হবিষ্যান্ন খাইব। মহাপুরুষের স্বর্গসুখে ব্যাঘাত না ঘটে, আমি এমন ভাবে থাকিব। আমার পাপ যে তাঁহাকে স্পর্শ করিবে। পৃথিবীর কলঙ্ক ধারণ করিয়া আমি সেই পরম দেবতার সেবা কি প্রকারে করিব।"

অতুল এই সব কথা যখন কাঁপিতে কাঁপিতে গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিল, তখন সকলে স্তম্ভিত হইল—গহনা পরিতে অনুরোধ করার সাধ্য কাহারও রহিল না।

অতুল তার পর হইতে হবিষ্যান্ন খায়, মৃত্তিকায় শয়ন করে, বার ব্রত উপবাস করে, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করে;—কেবল লোকের সেবা শুশ্রূষা করে, দেবতার গৃহ মার্জ্জনা করে, দেবতার

সেবা করে, অতিথির সেবা পরম পুণ্য বলিয়া মনে করে। এই সব কার্য্য দেবীর ন্যায় অতি যত্নে আগ্রহে সম্পন্ন করিতে করিতে এক বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যুর দিনে শুভ নক্ষত্রে মৃত্যুশয্যায় স্বামীপদ চিন্তা করিতে করিতে অতুল স্বামীর নিকটে চলিয়া গেল।

ব্রহ্মপিসী।

ব্রহ্মপিসী বিধবা হইবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র গ্রামের নসিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পিসী ছিলেন! বিধবা হইয়া শ্বশুর বাটী হইতে তাঁহার আড্ডা তুলিয়া, পিত্রালয়ে ভাইপোর সংসারে গিন্নি হইয়া বসিলে, কয়েক বৎসরের মধ্যে নসিরামের পিসী, গ্রাম শুদ্ধ লোকের পিসী হইয়া পড়িলেন। এটা যেন তাঁর একটা খেতাব বা টাইটেলের মধ্যে পড়িয়া গেল। নাম ব্রহ্ম, খেতাব হইল পিসী—সর্ব্বশুদ্ধ ব্রহ্ম পিসী! পাড়ার যে সম্পর্কে নাতি নাতিনী ভাই ভগিনী, তারা পর্য্যন্ত ব্রহ্মপিসী বলিতে লাগিল। তবে বিজ্ঞেরা সাক্ষাতে উপযুক্ত সম্পর্ক অনুসারেই সম্বোধন করিতেন, কিন্তু আড়ালে কথা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মপিসী বলিতেন। কালক্রমে ব্রহ্মপিসীর নামটী গ্রাম পার হইয়া গ্রামান্তরে পঁহুছিল। ১০।১২ খানা গ্রামে ব্রহ্মপিসী প্রসিদ্ধা হইলেন অর্থাৎ এক সময়ে ব্রহ্ম ১০।১২ খানা গ্রামের পিসী হইলেন।

ব্রহ্মপিসীর গুণই অধিক ছিল। যে সময়ে ব্রহ্মপিসী—নামের খুব ছড়াছড়ি, সে সময়ে ব্রহ্মপিসীর চুল পাকিয়াছে, ৪।৫টী দাঁত পড়িয়াছে। হেঁট্ হইয়া দক্ষিণ হস্তে বাড়ি ধরিয়া

হাঁটেন। গঙ্গা হইতে ২ ক্রোশ দূরে বাটী ছিল, কিন্তু ব্রহ্মপিসী ভোরে উঠিয়া, তৈল মাখিয়া, বগলে পরিবার থান ধুতি লইয়া, যষ্টি হস্তে প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন। স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে বাটীর উঠানটী ঝাঁট দিয়া, তার পর, চৌকাট হইতে আরম্ভ করিয়া বাটী হইতে ৩০।৪০ হাত দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেন। তুলসী-তলাটী ভাল করিয়া নিকাইতেন। গঙ্গা-স্নান করিয়া প্রফুল্ল মনে হরিধ্বনি করিতে করিতে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও ব্রহ্মপিসীর গায়ে খুব জোর ছিল; বাড়ি হাতে লইয়া দ্রুতবেগে চলিতে পারিতেন।

ব্রহ্মপিসী নানারূপ তুক্‌-তাক্‌ জানিতেন। কোথায় যাইতে হইলে তুক্‌ করিয়া বাহির হইতেন, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। ব্রহ্মপিসী টোট্‌কা ঔষধ নানা প্রকার জানিতেন। ঝাড়ন-মন্ত্র অসংখ্য শিখিয়াছিলেন। তাঁর বাটীর ভিতরে উঠানে একটী বড় তুলসী গাছ ছিল, সেই তুলসী-তলে বসিয়া ব্রহ্মপিসী কখন পা মেলিয়া ভোঁ ভোঁ ভোঁ শব্দে চরকা কাটিতেন, কখন ঔষধের বকাল কুটিতেন। আবার কুল, আম, জাম, আমড়া প্রভৃতির আচার প্রস্তুত করিতে ব্রহ্মপিসীর মত কেহ পারিত না। রান্নায় ব্রহ্মপিসী ১০।১২ খানা গ্রামের মধ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে—বিবাহ বাড়ীতে ব্রহ্মপিসী না আসিলে যজ্ঞের আস্বাদন কমিয়া যাইত। যজ্ঞটা যেন আলুনি হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মপিসী নানাবিধ ঔষধ মন্ত্রাদি জানি-তেন। শক্ত শক্ত রোগ কবিরাজি সুচিকিৎসকগণ যাহা আরাম করিতে পারিতেন না, ব্রহ্মপিসী হাসিতে হাসিতে দুটী ফুঁ দিয়া,

বা পান্তা ভাতের সহিত কোন একটা শিকড় বাটিয়া খাইতে দিয়া, আরাম করিতেন। প্লীহা যকৃতের রোগী যমালয়ের দ্বারের নিকট আসিয়াছে—ব্রহ্মপিসী মুড়ি পড়া খাওয়াইয়া যমদ্বার হইতে ফিরাইতেন। বড় আমাশয়ে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে—ব্রহ্মপিসী কি একটা মাদুলি ধারণ করিতে দিলেন, আর যা ইচ্ছা তাই খাইতে বলিলেন, রোগীও অল্পদিনের মধ্যে জিলিপি কচুরি কড়াইভাজা প্রভৃতি খাইতে খাইতে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া উঠিলেন। সাপের বিষ যেরূপ উগ্র হউক না কেন, ব্রহ্মপিসী তিন চাপড়ে ও তিন ফুঁয়ে নামাইতে পারিতেন।

এই সকল গুণ থাকায় দেশ বিদেশ হইতে রোগী আসিত—ব্রহ্মপিসীর নিকট ঔষধাদি লইত। এই সকল চিকিৎসার জন্য ব্রহ্মপিসী পয়সা লইতেন না। তবে ঔষধাদি দিবার সময় বলিতেন, আরাম হইলে আমার বাটীর অন্নপূর্ণার কিছু পূজা দিও। সেই পূজার আয়ে ব্রহ্মপিসীর ঔষধাদির খরচ পত্রাদি চলিত। কিন্তু একটী পয়সা নিজে ব্যয় করিতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ও পয়সা পেটের জন্য খরচ করিলে ঔষধের আর গুণ থাটিবে না—ঔষধ ভোঁয়া হইবে। আজ কাল যে সকল স্ত্রীলোক চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মপিসীর পদধূলি গ্রহণ করুন এবং লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া বার বার পৃথিবীর ধূলায় মিশিতে প্রার্থনা করুন। ভগবান্! কি ভারতবর্ষ কি হইতেছে!!

আজকালের বাজারে যদি ব্রহ্মপিসী থাকিতেন তো মনে করিলে, সংবাদ পত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম-

বিশ্বাস এত প্রবল ছিল, যে, চিকিৎসার জন্য পয়সা গ্রহণ করা মহাপাপ বলিয়া বোধ করিতেন।

গ্রামের বউ ঝি, ব্রহ্মপিসীকে বড় ভয় করিত—বড় ভক্তি করিত। কোন বউ ঝির একটু বেচাল দেখিলে, ব্রহ্মপিসী যৎ-পরোনাস্তি তিরস্কার করিতেন এবং সেই তিরস্কার একবার যে শুনিত, সে কিছুকালের জন্য সাবধান হইয়া চলিত। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কার কিরূপ স্বভাব ব্রহ্মপিসী সুন্দররূপ বুঝিয়াছিলেন। কে কিরূপ সতী, কিরূপ কলহশীলা, লজ্জা-শীলা, সে বিষয়ের সুপারিস ব্রহ্মপিসীর ঠোঁটে লেখা থাকিত—সময়ে সময়ে ব্রহ্মপিসী শাশুড়ি শ্বশুরদিগকে শুনাইতেন। যে বধূ ব্রহ্মপিসীর সুখ্যাতি লাভ করিত—তার সৌভাগ্য যেন উথলিয়া উঠিত। কিন্তু ব্রহ্মপিসীর তিরস্কার যাহার উপর পড়িত সে যেরূপ দুষ্টা স্ত্রীলোক হউক না কেন ভয়ে কাঁপিত—দুঃখে কাঁদিত, কিন্তু এই তীব্র তিরস্কার ঔষধের ন্যায় কার্য্য করিত।

কাহারও বাটীতে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঝগড়া বিবাদ হইলে ব্রহ্মপিসী তাহা ভঞ্জন করিতেন। অনেক বিজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মপিসীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন।

ব্রহ্মপিসীর বড় শুঁচিবাই ছিল, সেই গ্রামের অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন। হাতে একটু কিছু ময়লা বা কাদা লাগিলেই পুকুরে গিয়া ভাল করিয়া ধৌত করিতেন, ঘরের জলে ধুইলে অপবিত্র থাকিবে মনে করিতেন। একটু কাদা কি গোবর মাড়াইয়াছেন অমনি বিষ্ঠা সন্দেহ করিয়া স্নান করিতেন ও সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গাজল লইতেন।

ব্রহ্মপিসীর আর একটী বিশেষ গুণ ছিল তিনি বেশ ছড়া

রচিতে পারিতেন। তাঁর রচিত অনেক ছড়া এখনও নাকি বাল্য-কালে অনেকে উচ্চারণ করিয়া সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

উড়কি ধানের মুড়কি দেব, পথে জল খেতে
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, শাশুড়ি ভুলাতে—

এই প্রকারের অনেক ছড়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গ্রামের কোন বউ ঝি বিশেষ পাপকর্ম্ম করিলে তার নামে ব্রহ্মপিসীর ছড়া বাহির হইত—জেলার কোন জমিদারের কারা-গার হইলে, তার নামে ব্রহ্মপিসীর ছড়া বাহির হইত—সেই ছড়া মুখে মুখে কাণে কাণে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িত। বালক যুবা চাষা, মাঠে ঘাটে সেই সব ছড়া সুর করিয়া গাহিত। তাঁর একটী ছড়া আমার মনে আছে :—

(কোন দুশ্চরিত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া)

ক্ষুদি রাক্ষসির ঝি কল্লি তুই কি ?
কুলে দিলি কালি দেশান্তরে গেলি ;
চোদ্দপুরুষ একবারে নরকে ডুবালি।

ব্রহ্মপিসী যত দিন জীবিতা ছিলেন, তত দিন গ্রামটা যেন জীবন্ত ছিল।

এক দিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মপিসী পা মেলিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে বুঝিতে পারিলেন, তাঁর পৃথিবীর হিসাব ফুরাইয়াছে। অমনি বুকের ভিতরে একটা উচ্ছ্বাস উঠিল। নসিরামের স্ত্রীকে কাছে ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন "বউ মা! একটু বোস্‌, গোটা কতক কথা বলি।"

বউ মা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বসিলেন (সে কালের ৩।৪ ছেলের মায়েরাও শাশুড়ির কাছে ঘোমটা দিয়া থাকিতেন।)

ব্রহ্মপিসী বলিলেন "মা! তুমি আমার জন্ম এয়ো স্ত্রী হয়ে থাক। তোমার শ্বাশুড়ি মরবার সময় তোমাদের আমার হাতে সঁপে দিয়ে ছিল। তুমি তখন বের ক'নে ছেলে মানুষ। তা মা। সময় হলেই সকলকে যেতে হয়। তারা ভাগ্যবান যে, রেখে গিয়েছে! আমার ও সময় হয়েছে। যাই নাই কেন তাই আশ্চর্য্য।

কথাগুলা শুনিতে শুনিতে বউমার প্রাণটা কেমন হইতে লাগিল—চক্ষু দুটা ঘোম্‌টার ভিতরে ছল্‌ ছল্‌ করিতে থাকিল, বউমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। ব্রহ্মপিসী আবার বলিলেন, "হরির কৃপায় তোমাদের রেখে, যে পথে স্বামী পুত্র তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ি সেই পথে এখন যেতে পারলেই ভাল। তা আমার দিন ফুরিয়ে তো এসেছে—এখন ঔষধ গুলো তোকে চুপে চুপে বলে দি আয়।"

বউমা পিস্‌শ্বাশুড়ীকেই শ্বাশুড়ি বলিয়া জানিতেন। এখন সেই স্নেহের প্রস্রবণ অন্তর্হিত হয়—বুঝিতে পারিয়া আকুল প্রাণে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মপিসী স্নেহের অঞ্চল দিয়া বউমার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলেন। তার পর বউমার মন কথঞ্চিৎ স্থির হইলে ব্রহ্মপিসী ধীরে ধীরে এক একটী করিয়া ঔষধের কথাগুলি বউমাকে বলিয়া দিলেন। বউমা শাস্ত্র শিখিবার ন্যায় সমুদয় শিখিয়া লইলেন।

পরদিন সকালে ব্রহ্মপিসীর জ্বর দেখা দিল। ব্রহ্মপিসী আত্মীয়-দিগকে সেই দিনই গঙ্গাযাত্রা করিবার কথা বলিলেন। উপযুক্ত সময়ে গঙ্গাযাত্রা করান হইল। ব্রহ্মপিসী আপনি গঙ্গায় অবগাহন

করিলেন। গঙ্গা জলে হরিনাম জপিতে জপিতে ব্রাহ্মভাবে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। গঙ্গাজলের উপরে মৃত্যুকালীন সেই পবিত্র মূর্ত্তি, সমুপস্থিত সকলের মনে চিরকালের মত অঙ্কিত থাকিল।

পূর্ব্বকালে গ্রাম বিশেষে ব্রহ্মপিসীর মত অনেক দেবী ছিলেন—এখন সবই লুপ্ত হইতেছে।

দেবভক্তি।

তারকেশ্বরের চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বন্দীপুর নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটী নদী আছে। সে নদীতে এখন বর্ষায়, দামোদরের বন্যার জল আসিয়া থাকে—গ্রীষ্মে ও শীতে দামোদরের সুবিমল স্বচ্ছ নীর-ধারা ক্ষুদ্রায়তনে প্রবাহিত হয়। কিন্তু যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে সে সময়ে উহার দামোদরের সহিত সংযোগ বন্ধ হইয়াছিল—নদীর মোহানার উপরে অনেক বাগান বাড়ি দেখা যাইত। সে সময়ে নদীটীকে 'কানা' নদী বলিত। এই নদীর ধারে বন্দীপুর গ্রামে দামোদর ভট্টাচার্য্য নামে সেই সময়ে একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার নদীতীরে একখানি প্রকাণ্ড আম্র উদ্যান, উদ্যান-সংলগ্ন একটী বড় পুষ্করিণী এবং বন্দীপুরের উত্তর মাঠে ব্রাহ্মণের ১২।১৩ বিঘা দেবত্ব জমী ছিল। বন্দীপুরে ব্রাহ্মণের অনেক যজমান। দামোদর ভট্টাচার্য্যের বহির্বাটীতে একখানি প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, সেই চণ্ডীমণ্ডপে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে 'মা দশভুজা' আসিতেন। দামোদর, মার পূজা বড় সাত্বিকভাবে সম্পন্ন করিতেন বলিয়া, নিকটবর্ত্তী ১০।১২

খানা গ্রামে দামোদরের দুর্গা পূজার প্রশংসা হইত। অনেকেই বলিত, দামোদর ভট্টাচার্য্যের দুর্গা পূজায় 'মা বাস্তবিকই আসিয়া থাকেন।

দামোদর খুব পণ্ডিত ছিলেন—খুব ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, কলিযুগে সেরূপ আদর্শ হিন্দু-জীবন সে জেলায় আর দেখ যাইত না।

একদিন দামোদর বিজয়ার দিন কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া, মার শোকে অচেতন হইয়া মার প্রতিমার ঠাটের সম্মুখে পড়িয়া আছেন—ভক্তির অশ্রুজলে মাটী ভিজিয়া যাইতেছে—তাঁর চারিদিকে অনেকগুলি বৃদ্ধ, যুবা, বালক, বসিয়া দুর্গা নাম লিখিতেছেন, এমন সময়ে দামোদর দেখিলেন, এক ষোড়শী রমণী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, 'বৎস তুমি শোকে কাতর হইও না—আমি এক বৎসর পরে আসিয়া তোমার একটী পুত্র সন্তানকে দেখিব—তার দেব-ভক্তিতে তোমার বংশ পবিত্র হইবে—কিন্তু সে গৃহে থাকিবে না।' দামোদর এই সকল ঘটনা দর্শনে, মা কৈ, মা কৈ, বলিয়া চীৎকারের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া, সকলের দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে পাগলের মত চাহিতে চাহিতে বলিলেন, 'তোমরা কি আমার মাকে দেখেছ? মা এই যে আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে কোথায় চ'লে গেলেন।' একে বিজয়ার শোকে সকলেই ক্ষুব্ধ চিত্ত ছিল, তাহাতে ভক্ত দামোদর ভট্টাচার্য্যের এই সকল ভক্তির কথা শুনিয়া সকলে 'মাগো' 'মাগো' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই খানে মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। দামোদর

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ওরে আমার আর কিছু ভাল লাগে না—মা যে আমার দেখা দিয়ে কোথায় লুকালেন।' তাহার পর দামোদর 'মা ভগবতী! মা ভগবতী! জগজ্জননী! তুই কোথায়?' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দামোদরের গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া ২।৪ জন পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সে দিন অন্যান্য সকলে কোলাকুলি প্রণামাদি করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। দামোদর সেইখানে থাকিলেন। দামোদরের স্ত্রী ও ভগিনী দামোদরের কাছে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল। রজনীতে দামোদরের ভক্তির নানাবিধ উচ্ছ্বাস, প্রলাপ, দামোদরের স্ত্রী ও ভগিনীকে কাঁদাইল। তাহারা সে দিন চণ্ডীপণ্ডপ—বাটী—এবং আপনাদের জীবন, মার অভাবে শূন্য শূন্য অনুভব করিতে লাগিল। আবার কবে আশ্বিন মাস আসিবে ভাবিয়া, অশ্রুমোচন করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিল। বিজয়ার দিন হইতে দামোদর নাকি আট দশ দিন বাটীর ভিতরে আর যাইত না—সেই চণ্ডীমণ্ডপেই থাকিত;—কখন স্মৃতি নেত্রে সেই দশভুজা মূর্ত্তি—সেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ পরিবেষ্টিতা জননীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আকুল প্রাণে কাঁদিত—কখন মাথার চুল ছিঁড়িত—কখন মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিত। বিজয়ার দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই কাঁদিয়া থাকে—কিন্তু দুই এক দিন পরে সে কান্নার ভাব আর থাকে না—কিন্তু সেই কান্নার বেগ সমস্ত বৎসর দামোদর হৃদয়কে যন্ত্রণা দিয়া থাকে—আবার যখন শ্রীনাথ পোটো প্রতিমায় খড় জড়াইতে থাকে—তখন যন্ত্রণার বেগ

ঘুমিয়া যায়—আবার আনন্দের রেখা, আশার রশ্মি দামোদরের মুখে খেলিতে থাকে।

পর বৎসর পূজার একমাস পূর্ব্বে ভাদ্র মাসে দামোদরের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এ পর্য্যন্ত দামোদর নিঃসন্তান ছিল—এখন অধিক বয়সে পুত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইল। পুত্রের নাম রাখিল—দুর্গাদাস।

দামোদরের বাটীতে শালগ্রাম শিলা ছিল। দামোদর অতি ভক্তির সহিত তাঁর পূজা করিতেন। দুর্গাদাস যখন বেশ চলিতে পারে;—দৌড়িতে পারে—তখন শাল-গ্রামের পূজার সময় দুর্গাদাস বাপের পিছনে পিছনে ঠাকুর ঘরে যাইত। একটী ধারে বসিয়া পূজার মন্ত্র শব্দ শুনিত—আনন্দে হাসিত—ঘণ্টা বাজিবার সময় দাঁড়াইয়া আমোদে নৃত্য করিত।

দুর্গাদাসের বয়স যখন ৪ বৎসর হইল; মুখে বেশ কথা ফুটিল; তখন শালগ্রামের পূজার সময় বাপের কাছে বসিয়া এক দৃষ্টে সেই বিগ্রহের দিকে তাকাইত; বাপের সঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করিত।

দুর্গাদাসের দৌরাত্ম্য ঠাকুরের নাম করিলেই নিবারিত হইত। অত অল্প বয়সে দুর্গাদাসের দেবভক্তি দেখিয়া দামোদর এবং অন্যান্য অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছিল। দুর্গাদাসের মা কখন কখন বলিত, (এ ছেলে কি বাঁচবে।)

এ দিকে ভাদ্র মাসে যখন দুর্গা প্রতিমার কাটে ঘা পড়িত, বাটীতে মহা রোলে শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজিত; তখন দুর্গাদাসের প্রফুল্লবদন দেখিলে অনেকের প্রাণ ভক্তিতে বিগলিত হইত। দুর্গাদাসের বয়স যখন ৫ বৎসর, তখন হইতে সে ভক্তিতে এক

এক দিন কাঁদিয়া ফেলিত। দুর্গোৎসবের সময় যখন ধূপ ধুনা জ্বালিয়া চামর পাখার বাতাস দিতে দিতে দুর্গা প্রতিমার আরতি হইত; শাঁখ, ঘণ্টা ও কাঁসরের সহিত কাড়ানাগরার বাজনা বাজিত এবং দামোদর ভট্টাচার্য্য উন্মত্তের মত মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, দেবমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত, তখন বালক দুর্গাদাস চণ্ডীমণ্ডপের একটি পাশে অবাক ভাবে বসিয়া নীরবে চক্ষের জল ফেলিত—কখন বাপের দিকে তাকাইয়া থাকিত, কখন বা স্বর্ণময়ী প্রতিমার দিকে সজল নেত্রে নিরীক্ষণ করিত। দুর্গাদাসের সেই অবস্থায় দুর্গাদাসের পিসী ও অন্যান্য বৃদ্ধাগণ দুর্গাদাসকে কোলে লইয়া, 'বাবা! তুই ধ্রুব না প্রহ্লাদ! তোর ভিতরে মার এত খেলা! মাগো! চৈতন্যরূপিনী! বাছাকে বাঁচিয়ে রাখ—বলিয়া দুর্গাদাসের মুখ চুম্বন করিত। দুর্গাদাস তখন প্রবলতর বেগে কাঁদিয়া ফেলিত। ঠাকুর বিসর্জ্জনের দিন পিতার ক্রন্দনের সহিত ক্রন্দন করিত। বাপকে জিজ্ঞাসা করিত, 'বাবা! তুই কাঁদিস কেন?' বাবা বলিত 'বাবা। মা আমাদের বাটীতে তিন দিন ছিলেন, আজ আর থাকবেন না—কৈলাসে যাবেন। তাই প্রাণ কেমন করছে।' পিতার চক্ষের জলের সহিত এই সকল কোমল কথা দুর্গাদাসের কোমল প্রাণে এমনি আঘাত করিত যে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিত, "তা তুই কাঁদছিস কেন; আমি যেমন মার সঙ্গে পাল্কি ক'রে, মামার বাড়ি যাই, তেমনি তুই মার সঙ্গে যানা কেন? বাবা আমিও তোর সঙ্গে যাব।' বালকের মুখে এই সরল ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিতে শুনিতে দামোদর মার ভাবে অস্তিত্বকে পূর্ণ করিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিত।

ছয় বৎসর বয়সে দুর্গাদাস গ্রামের পাঠশালায় লিখিত। কিন্তু তার লেখা ভাল লাগিত না। পূর্ব্ব রাত্রে পিসীমার কাছে যে কপালীর কথা শুনিয়াছিল; মুকুন্দ ঘোষের পাথর হইবার কথা শুনিয়াছিল; কবে বাপের নিকট প্রহ্লাদের গল্প ও ধ্রুবোপাখ্যান শুনিয়াছিল; সেই সব পাঠশালায় বসিয়া ভাবিত। তবে দুর্গাদাসের বুদ্ধির প্রখরতাবশতঃ শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অষ্টম বৎসরে শুভঙ্করী অঙ্ক কষিতে, শিশুবোধ পড়িতে শিখিল। দুর্গাদাস পাঠশালায় তালপাতে নাম লিখিবার সময় কেবল দেবতাদিগের নাম লিখিত। এক দিন গুরু মহাশয় দেখিল দুর্গাদাস কাঁদিতে কাঁদিতে নাম লিখিতেছে। গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসিল, 'দুর্গাদাস কাঁদছ কেন? কেউ মেরেছে?' দুর্গাদাস কোন উত্তর করিল না। একজন কাছের ছেলে বলিল, 'গুরু-মহাশয়! ও রোজ অমনি নাম লেখবার সময় কাঁদে।' 'আমি ওকে মশাই! এক দিনও মারিনি।' গুরুমহাশয় উঠিয়া গিয়া দেখিল, দুর্গাদাস ক্রমাগত "দুর্গা" "দুর্গা" লিখিতেছে—পাতার মাঝে মাঝে চক্ষের জল ফেলিয়াছে। "দুর্গাদাসের খুব ভাল হউক," বলিয়া দেব-ভক্তিতে কাতর কাতর হইয়া গুরুমহাশয় নিজ স্থানে গেল।

এক দিন দুর্গাদাস পাঠশালে আসিতে আসিতে বাস বনে একটী সুগোলাকার প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইল। সে, যতনে সেটীকে কুড়াইয়া দোবজনের ভিতর রাখিল। পাঠশাল হইতে ঘরে আসিয়া, ঠাকুর ঘরের দাওয়ার এক পাশে একখানি ইট ধুইয়া তার উপরে সেটীকে রাখিল। রাখিয়া, ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিল। দুর্গাদাস সেই ঠাকুরটী পাঠশালে যাইবার সময়

যতনে করিয়া লইয়া যাইত। এক দিন পাঠশালার একজন দুষ্ট ছেলে সেই ঠাকুরটী চুরী করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরের পাঁকে ফেলিয়া দিল। দুর্গাদাস পাঠশালার ছুটী হইলে জোর-দানের ভিতরে কলম, পেন্সিল, কাগজ, পুস্তক দেখিল—ঠাকুর দেখিতে পাইল না। গুরুমহাশয়ের নিকট নালিস করিল। গুরুমহাশয়, কাল বিচার হবে, বলিয়া চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা। দুর্গাদাস কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেল। গিয়া দড়াম করিয়া উঠানে পড়িয়া, "ওগো আমার ঠাকুর চুরী করেছে কে," বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দুর্গাদাসের মা, পিসী, বাপ উঠানে আসিয়া নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিল। দুর্গাদাসের কিছুই ভাল লাগে না। দুর্গাদাসের বাপ, সন্তানের দেবভক্তির তোড় দেখিয়া উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে, সজল-নয়নে, দুর্গাদাসকে কাল ঠাকুর দেবে, বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিল। পিতা, মাতা, পিসীর অনেক চেষ্টায় দুর্গাদাস উঠান হইতে উঠিল। কিন্তু কোন ক্রমেই কিছু খাবে না। নিজেও খাইল না, কাহাকেও খাইতে দিল না; ঠাকুরের জন্য ভয়ানক হাঙ্গামা করিল। পিতা দামোদর, অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, 'আচ্ছা দুর্গাদাস! আমাদের ঘরে তো ঠাকুর আছেন, তবে অত কাঁদছ কেন?' দুর্গাদাস বলিল, 'সে ঠাকুর তো তোর; সে ঠাকুর আমায় তবে দে, আমি আমার বিছানায় কাছে নিয়ে শোবো, আমি আমার ঠাকুরকে তো বিছানায় আমার বালিশের কাছে রেখে শুয়ে থাকি।' পিতা বলিল, 'আচ্ছা আজ আমরা ঠাকুর ঘরে শোব এখন।' দুর্গাদাস এ কথায় অনেকটা শান্ত হইল। শান্ত হইয়া আবার কাঁদিতে,

লাগিল। "আমি আমার ঠাকুর না পেলে কখন খাব না,' বলিয়া কান্নার বেগ বাড়াইল—পিতা, মাতা, পিসী সকলকে দেবভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসাইল।

দুর্গাদাস কাঁদিতে কাঁদিতে মার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে শোকের বেগে শরীর কাঁপাইয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। দুই তিন ঘণ্টা পরে দুর্গাদাস, 'মা! মা! বাবা! বাবা! ঐ যে আমার ঠাকুর! ঐ যে আমার ঠাকুর!' বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাসের মা ও পিসী বলিল "কৈ ঠাকুর বাবা! কৈ তোমার ঠাকুর।' দুর্গাদাস কথার উত্তর না দিয়া দাঁড়াইল—এক দিকে ছুটিল। ওমা! ছেলে কোথা যায় গো! ও ঠাকুর-ঝি তাকে ডাক না! ছেলেকে কিছুতে পেলে না কি! বলিতে বলিতে মা দ্রুতবেগে গিয়া সন্তানকে ধরিল। ধরিলে, "মা! তোরা আমার সঙ্গে আয়—আমাদের পাঠশালের সামনে, তাল-পুকুরের সেই হানা তালগাছের তলায়, আমার ঠাকুর পড়ে আছে, আমি দেখতে পেয়েছি" ;—হৃদয়ের আবেগের সহিত দুর্গাদাস এই কথা বলিল। এ দিকে দামোদর ভগিনীর ডাকে উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'কি হয়েছে?' দুর্গাদাস বাবার হাত ধরিয়া বলিল, 'বাবা! তুমি আমার সঙ্গে চল, ঠাকুর পেয়েছি; সেই পাঠশালের সামনে পুকুরের হানা তালগাছের তলায় আছে।'

তখন জ্যোৎস্না ছিল। পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিতা চলিল। সেই পুকুরের ঘাটে নামিয়া, দুর্গাদাস উন্মত্তের ন্যায়, "ঐ তাল-গাছের নীচে," বলিয়া এক চীৎকার করিল। দুর্গাদাস দ্রুত-বেগে সেই গাছের দিকে দৌড়িয়া গিয়া তাল তলায় পতিত সেই

প্রস্তরখণ্ড—সেই বিগ্রহ—সেই দেবতাকে গ্রহণ করিল। এই ঘটনা দেখিয়া দামোদর, ভক্তি বিশ্বাসের এক অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এই সংসারের অনিত্যতা এবং ভক্তির মাহাত্ম্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ভক্ত পুত্রের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী ও ভগিনীকে অনেক কথার মধ্যে এই কথাটী ভক্তির আবেগের সহিত বলিলেন, "ভক্তি যে পাত্রে পড়ে, সেখানে ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া যে লীলা করেন, তা বোধ হয় দেখলে। কাল হইতে ঐ শিলার নিয়মিত রূপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ভক্তি যে, প্রস্তর-মৃত্তিকায় ঈশ্বরকে জাগ্রত করেন, তা ভগবান্ আমার দুর্গাদাসের ভক্তির ভিতর দিয়া, দেখাইলেন।" উপদেশ শুনিতে শুনিতে সকলে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। দামোদর পরদিন দুর্গাদাসের 'শালগ্রামকে' রীতিমত অনুষ্ঠানের সহিত দেবগৃহের এক অংশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পিতা-পুত্রের ভক্তিতে দেশটী জাগ্রত হইতে লাগিল। দুর্গাদাসের বয়স যখন ১৮ বৎসর হইল, তখন দুর্গাদাস মহাভক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিনাম শুনিলেই কাঁদিতেন, ঠাকুর দেখিলেই ভাবে অভিভূত হইতেন। সেই সময়ে দামোদর পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। দুর্গাদাসের জননী কয়েক মাস পরে স্বামীর অনুসরণ করিলেন। দুর্গাদাস পিসীমার নিকট একটী আত্মীয় ভ্রাতাকে রাখিয়া, বিষয়াদি সেই ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিয়া, ভক্তি বৈরাগ্যের তাড়নায় সংসার হইতে অবিবাহিত অবস্থায় জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সঙ্গীতানুরক্তি।

(একটা গল্পমাত্র)

কখন গান গাহে নাই বা গানে মুগ্ধ হয় নাই—এমন লোক নাই। যদি থাকে, সে নরহত্যা না করিয়া থাকিতে পারে না—সে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব নহে।

সঙ্গীতের মত মোহিনীশক্তি আর কিছুরই নাই। গানের শব্দে সাপ ফণা তুলিয়া কি শুনে—শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে থামে—বনের বাঘ বিমোহিত হয়—গভীর শোক শুকাইয়া যায়। তোমার গান অপরের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার গানে আপনি মোহিত হও। যখন মনে ভাবের তরঙ্গ উঠে, তখন নীরবে প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? মানুষ এরূপ অবস্থায় গান না গাহিয়া থাকিতে পারে না। তার গানে হয়তো পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল জ্বালাতন হইতে পারে, কিন্তু সে গান গাহিয়া, প্রাণ খালি করিয়া, একটা তৃপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন হইতে হইতে, জীবনের দুঃখ ভুলিয়া সুখের স্বর্গ সম্ভোগ করিতে থাকে। পাঠক! এ বিষয়ের একটা গল্প বলি শুন:—

কোন সহরে পাঁচকড়ি নামে একজন ব্রাহ্মণ-যুবক ছিল। সে লোকটা বড় সঙ্গীতপ্রিয়। যাত্রা পাঁচালী কবি শুনিতে এত ভাল বাসিত যে, নিজ বাসস্থান হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে, কোন দলের গাহনা হইতেছে, জানিতে পারিলে, বাড়িতে নানা বিপদ সত্বেও, তাহা শুনিবার জন্য গমন করিত। গাহনা শুনা ছাড়া পাঁচকড়ির গান গাহিবার প্রবৃত্তিও অত্যন্ত অধিক ছিল।

ঘরে বাহিরে মাঠে বাটে শয়নে স্বপনে গান না গাহিয়া থাকিতে পারিত না। বিবাহ করিবার পর গান গাহিবার বাতিক বড় বাড়িয়া গেল।

ভগবান নিখুঁত জিনিস কিছুই স্মরণ করেন নাই। সুতরাং পাঁচকড়ির গান গাহিবার শক্তিতে যে একটী প্রবল দোষ বুসাইয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই দোষী। তাহাতে পাঁচকড়ি ব্যাচারার কোন দোষ নাই।

পাঁচকড়ি অনেক গান শিখিয়াছিল। সর্ব্বদা গান গাহিত। কিন্তু গলার স্বরটি এমনি বিকৃত—ভীষণ কর্কশ, যে সে স্বর উঠিবামাত্র মানুষের কাণে যেন বিষ বর্ষণ হইত—মানুষ শুনিতে শুনিতে জ্বালাতন হইয়া—হয় পাঁচকড়িকে চুপ করিতে বলিত—না হয়, সে স্থান হইতে সরিয়া যাইত। পাঁচকড়ির সে সময়ে পুত্র শোক উপস্থিত হইত। ব্যাচারা এত পরিশ্রম করিয়া গায়—আর লোকে জ্বালাতন হয়; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! পাঁচকড়ির একেতো সুরবোধ ছিল না; তাহাতে আবার স্বর-কর্কশতা থাকায়, গানের শব্দ হইবামাত্র পৃথিবীতে যেন একটা ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইত। পাঁচকড়ির গানে যে কেবল মানুষে জ্বালাতন হইত তাহা নহে; বাগানে বসিয়া গান গাহিলে, গাছের কাক গুলাও নাকি বাস্তবিক কাকা শব্দে উড়িয়া, ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে, সে স্থান হইতে পলায়ন করিত—পাঁচকড়ির গানের আওয়াজে বন্দুকের আওয়াজের কাজ হইত।

পাঁচকড়ি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিত না। সে ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহারে একটু ও ত্রুটি করিত না।

বিবাহের পর পাঁচকড়ি সমস্ত রাত্রি গান গাহে। কাছে স্ত্রী ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর উদ্দেশে কত প্রেম, কত মিলন বিষয়ক গান গাহিয়া থাকে। প্রতিবাসীগণ রাত্রে ঘুমাইতে পারে না। সেই বিকট শব্দের বিকট তরঙ্গ তাহাদের কাণের পর্দায় পর্দায় যেন ছুঁচ ফুটাইতে থাকে। বাঘের স্বর বরং ভাল; কাকের গান বরং ভাল। কারণ তাহাতে স্বাভাবিকতা আছে; আর পাঁচকড়ির গানে ভূতের গানের অপেক্ষাও কর্কশতা থাকায়, তাহা শুনিয়া মানুষের প্রাণ চীৎকার করিয়া উঠিত। কাছের ২।৩টা কুকুরও সে গানে জ্বালাতন হইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া সমস্ত রাত্রি ডাকিতে থাকিত। কুকুরের ডাক অনেকের সহ্য হইত; পাঁচকড়ির গান যেন বিষবর্ষণ করিত। মানুষও জ্বালাতন হয়—পাঁচকড়ির গানের স্রোতও বাড়ে, সুতরাং পাড়ার সকলে একদিন একত্র হইয়া পরামর্শ করিল। পরামর্শের পর ৪।৫ জন করযোড়ে পাঁচকড়ির নিকট বিনীতভাবে বলিল "আমাদের রাত্রে ঘুম হয় না—তুমি যদি গান না গাও তো বাঁচি।" শুনিবামাত্র পাঁচকড়ি রাগে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধিতস্বরে বলিল, 'আমি আমার বাবার ঘরে বসিয়া গান গাই—তোমাদের তাতে কি? আমি গান কখনই থামাইব না—আমার গান তোমাদের ভাল লাগে না, কেন? আমি কি মানুষ নই?'

যাহারা বলিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২।৩ জন হাসিয়া উঠিল। পাঁচকড়ি সে হাসি দেখিয়া আরও রাগিল। ঘরে গিয়া আবার গান আরম্ভ করিল। লোকগুলা কানে হাত দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

পাঁচকড়ির গান কিছুতেই থামে না দেখিয়া, প্রতিবাসীগণ পাঁচকড়ির উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নে ৪।৫ জন যুবা রাগিয়া পাঁচকড়ির বাড়িতে প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিয়া পাঁচকড়িকে খুব প্রহার দিল। প্রহার খাইবার পরে পাঁচকড়ি মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, আর গান গাহিব না—যদি গাইতো গুণ গুণ স্বরে—জোরে আর নয়। কিন্তু পাঁচকড়ি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার অনেক বৎসরের পোষা গান তাহার শাসন কিছুতেই মানিতে চাহে না। পাঁচকড়ি যত চুপে চুপে গাহিতে যায়, গান সজোরে কণ্ঠ জিহ্বা ওষ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে থাকে এবং চারি দিকে পূর্ব্বের মত ভীষণতার স্রোত প্রবাহিত করে। পরিশেষে পাঁচকড়ি গানের অনুরোধে গৃহ ছাড়িয়া, সহরের বাহিরে একটী বড় রাস্তার ধারে একটী অশ্বত্থতলায় বসিয়া গান গাহিতে লাগিল। পাঁচকড়ি সকালে উঠিয়া সেই খানে গিয়া বসিত এবং মনের সাধে মেঠো হাওয়ায় আপনার স্বর ছাড়িয়া দিয়া কত কি গান গাহিত। প্রথম দিনের আওয়াজ শুনিতে শুনিতে অনেক পাখী সে অশ্বত্থ গাছ পরিত্যাগ করিল—কা কা কা কা শব্দে কাক সকল—পাঁচকড়ির গানের সুরে মাধুরি বৃদ্ধি করিয়া আকাশকে প্রলয় সঙ্গীতে যেন ভাসাইয়া উড়িয়া যাইতে থাকিল। একটা হনুমান গাছে বসিয়াছিল—সে ব্যাচারা পাখী গুলার পলায়নের পূর্ব্বেই উপ্ উপ শব্দে লম্ফ ঝম্প করিয়া উৰ্দ্ধ লাঙ্গুলে গাছ হইতে পড়িয়া—মাঠের উপর দিয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। কাছে একটী তেঁতুল গাছে সহস্র সহস্র বাদুড় ঝুলিতেছিল, তাহারা সেই ভীষণ কর্কশতায়, সংসারে বুঝি প্রলয়

হইল ভাবিয়া, কিচ্ মিচ্ করিতে করিতে দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালনে যেন তেঁতুলগাছটীকে লইয়া আকাশে উড়িবার উদ্যোগ করিল। বাদুড়গণ একে একে দিশে হারার মত ক্ষিপ্তভাবে নানাদিকে চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি সেই সব কাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও গাহিতে নিরস্ত হইল না—ভগবানদত্ত অস্ত্রে ভগবানের রাজ্য ধ্বংসে নিযুক্ত থাকিল।

পাঁচকড়ির গান ২।৩ দিন পরে, মাঠের কৃষকদিগের কর্ণকুহরে ভয়ানক আঘাত করিতে লাগিল। যদি ভগবান পাঁচকড়িকে পৃথিবীতে পাঠাইবার আগে, মনুষ্যের কানের চামড়াকে গণ্ডারের চামড়ায় তৈয়ার করিতেন তো, পাঁচকড়ির গান গাহার দরুণ নির্ব্বোধ লোকে কখনই চটিত না, কিন্তু অন্ধ ঈশ্বর তাহা না করায় লোকেদেরও ক্লেশ, পাঁচকড়িরও যাতনা।

পাঁচকড়ির গানের জ্বালায় আধ ক্রোশের মধ্যে আর কোন কৃষক ক্ষেত্রে কাজ করিতে চাহিল না। ৫।৬ দিন পরে পাঁচকড়ি দেখিল ক্ষেত্রে আর কৃষক নাই—গাছে আর পাখী নাই—আকাশের পাখী তাহার কাছ দিয়া উড়িয়া যায় না। পাঁচকড়ি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া গান গাহার ক্রমশঃ উন্নতি করিতে লাগিল। সাপ—বেঙ, গর্ত্ত ছাড়িয়া দেশান্তরে গেল—শৃগাল খ্যাঁকশিয়ালীরাও বিবর ছাড়িল।

পাঁচকড়ি ভাবিল, একলা গান গাহিলে সুখ হয় না। এক জন শ্রোতা না থাকিলে গান গাহিয়া সুখ হয় না। মনে মনে ভাবিল, বিধাতা আমার কর্কশ কণ্ঠ দিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন বোধ হয়। আবার ভাবিল, কৈ আমি তো আমার গানে মোহিত হই। আমার গান আমায় যেমন ভাল লাগে, অন্যের

ওস্তাদের গান তো তত ভাল লাগে না। বোধ হয় আমার গানে মিষ্টতা অধিক, তাই লোকে অত্যন্ত আলাতন হয়—যাহা হউক একজন শ্রোতা চাই, নহিলে গান গাওয়া বৃথা। এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় দৈব-দুর্বিপাক বশতঃ সেই স্থান দিয়া একজন মজুর ঝুড়ি মাথায় দিয়া, এবং কোদাল হাতে করিয়া, কাজ করিতে যাইতে ছিল। পাঁচকড়ি তাহাকে ডাকিল।

পাঁচ। তুই কোথা যাচ্ছিস ?

কৃ। মাটী কাটিতে।

পাঁ। কত মজুরি পাস ?

কৃ। দিন চার আনা।

পাঁ। আমি রোজ নগদ চার আনা করিয়া দেব—আমার কাজ করিবি ?

কৃ। কি কাজ ?

পাঁ। কাজ আর কিছুই নয়—কেবল আমার কাছে বসিয়া বসিয়া—গান শুনিবি।

কৃষক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। ভাবিল, এতো খুব মজা দেখছি—লোকে পয়সা দিয়ে গান শুনে, আমাকে পয়সা দিয়া গান শুনাইতে চায়, এতো শুভাদৃষ্ট না হ'লে জোটে না। কৃষক মহানন্দের সহিত রাজী হইল।

পাঁচকড়ি বলিল, "তা আজই ব'স—আমি গান গাই—তুই শোন—পয়সা সন্ধ্যার সময় পাবি।"

কৃষক গান শুনিতে বসিল। পাঁচকড়ি তখন গম্ভীরানন্দে গান আরম্ভ করিল।

গানের ২।৩ টা কথা ভীষণ শব্দে কৃষকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহার অনেক বৎসরের সঞ্চিত কানের খোল রাশিকে আন্দোলিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, দুকান দিয়া দুইটী প্রকাণ্ড খোলের চাঁই পড়িয়া গেল। কৃষকের কান এখন উন্মুক্ত হওয়ায়, গান প্রবল ভাবে নির্ব্বিবাদে অবিরোধে কর্ণপটাহে আঘাত করিতে করিতে কৃষকের মগজে ব্যথা ধরাইয়া দিল। গান শুনিতে শুনিতে এক ঘণ্টার পরই কৃষকের ভয়ানক মাথা ধরিল—সর্ব্বশরীর ঘুরিতে লাগিল। কৃষক অবশেষে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, মহাশয়! আজ আমায় ছাড়িয়া দিন—কাল আবার আসিব।

পাঁ। ওবেলা আসিবি না?

কৃ। মাথা ছাড়িলে তো।

পাঁ। মাথা ধরিল কেন?

কৃ। আপনার গান শুনিতে শুনিতে।

পাঁ। দূর বেল্লিক! এই চার আনা নে। আরও একটা টাকা নে, আগামী দিলাম। কাল থেকে আবার আসিবি?

কৃষক এক টাকা চারি আনা কাপড়ে বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। কৃষককে পাঁচকড়ি চিনিত। কৃষক চলিয়া যাইলে, গায়ক ভাবিল, যদি টাকা আগামী লইয়া না আসে তো, ধরিয়া আনিব।

পরদিন অনেক বেলা হইল; কৃষক আসিল না। তখন পাঁচকড়ি কৃষকের জন্য বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, আপনারি ঘরে ফিরিল। আহার করিয়াই কৃষকের অন্বেষণে চলিল।

কৃষক তখন দাওয়ায় বসিয়া, পাথরে করিয়া ভাত খাইতে ছিল। ভাতের গ্রাস চিবাইতে চিবাইতে সম্মুখস্থ রাস্তায় পাঁচকড়িকে দেখিবামাত্র স্তম্ভিত হইল। কৃষক ভাবিল, না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তবু পয়সা লইয়া কাণ ঝালাপালা করিতে পারিব না। পাঁচকড়ি সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে, কৃষক পাঁচকড়িকে বলিল, "চুপ করিয়া ঐ পিঁড়েটার উপর বসুন—গান এখানে গাহিবেন না—আমার ছেলে ঘুমুচ্চে স্বপ্ন দেখে আঁত্‌কে উঠ্‌বে।"

কথাটী শুনিয়া পাঁচকড়ির মন্‌টী মুচড়াইয়া গেল। পাঁচকড়ি চুপ করিয়া বসিল। কৃষক ভাত খাইয়া উঠিবামাত্র পাঁচকড়িও উঠিল। কৃষক ডোবায় গিয়া আঁচাইল—আঁচাইয়া উঠিয়া এক দিকে দ্রুতবেগে চলিল—পাঁচকড়িও পশ্চাতে ধাবমান্ হইল। খানিকটা দূরে গিয়া কৃষক বলিল 'মহাশয়! আমি গান শুনিতে পারিব না—আমার মাথার মগজ পচিয়া যাবে।'

পাঁচকড়ি বলিল 'শালা! তবে আমার টাকা ফেরৎ দে বল্‌ছি।' কৃষক বলিল, আমি দেব না—আমার মাথার অসুখের চিকিৎসার খরচা কে দেবে। পাঁচকড়ি অবশেষে বিমর্ষ প্রাণে ফিরিয়া সেই অশ্বথ তলে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল।

পাঁচকড়ি গান গাহিতেছে এমন সময়ে জমিদারের গোমস্তা আসিয়া বলিল, 'মহাশয়! আপনার নামে যত প্রজা এই বলিয়া নালিশ করিয়াছে যে, আপনার গানের জ্বালায় কোন কৃষক ক্ষেত্রে কাজ করিতে পারে না। জমিদারের হুকুম, 'আপনি আজ হইতে আর এখানে বসিয়া গান না গাহেন।' পাঁচকড়ি বিমর্ষ মনে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

পরদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী জঙ্গলে গানের আড্ডা স্থির করিল। জঙ্গলে গিয়া গান ধরিল। গানের প্রথম উৎপাতে কাক, পাখী, শৃগাল, নেউল প্রভৃতিরা তো পলায়ন করিল। কিন্তু একদিন অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গলের ভূত সকল একত্র হইয়া ধর্ম্মঘট করিল।

ভূতেদের সভায় সকলে একমত হইয়া এই স্থির করিল যে, তাহাদের রাজা ব্রহ্মদৈত্য মহারাজকে পাঁচকড়ির নামে নালিশ করিতে হইবেক। যদি রাজা মহাশয় পাঁচকড়ির গানের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে না পারেন তো, আমরা এ জঙ্গল ছাড়িয়া অন্য জঙ্গলে অন্য ব্রহ্মদৈত্যের অধীনে বাস করিব।

পরিশেষে বেলগাছের ঝোঁপের মধ্যে ব্রহ্মদৈত্যের নিকট একটী প্রেতিনী ভূতদিগের দরখাস্ত লইয়া হাজির হইল। ব্রহ্মদৈত্য দরখাস্ত পড়িয়া বলিলেন, তুমি যাও—আমি কাল পাঁচকড়ির হাতে পায়ে ধরিয়া এখান হইতে বিদায় করিব। পাঁচকড়ির গানের জ্বালায় আমরাও জ্বালাতন হইয়াছি।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পাঁচকড়ি আনন্দের সহিত গান গাহিতেছে, এমন সময়ে, পশ্চাতের বৃক্ষ সকলের অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মদৈত্য বাহির হইয়া, খড়ম পায়ে গলায় ফুলের মালার সহিত, করজোড়ে পাঁচকড়ির সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। পাঁচকড়ি ভয়ে সিহরিয়া উঠিল। ব্রহ্মদৈত্য তখন বিনীতভাবে বলিল 'মহাশয়! আপনার পায়ে পড়ি, আর এ স্থানে আসিয়া গান গাহিবেন না—এ জঙ্গলে অনেক ভূত বাস করে। আপনার গানের কর্কশ স্বরে অনেক ভূত পলাইয়াছে—

আরও যদি উৎপাত করেন তো, অবশিষ্ট সকলেই পলাইবে—আমাকেও পলাইতে হইবেক।"

পাঁচকড়ি তার পরদিন হইতে, ভুতের ভয়ে আর সে জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ করিল। মনের কষ্টে অবশেষে দেশত্যাগ করিল।

দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে একটী গ্রামে গিয়া শুনিল, সে গ্রামের জমিদারের স্ত্রীকে ভূতে পাইয়াছে—কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারিতেছে না। পাঁচকড়ি ভাবিল, আমার গানে যখন জঙ্গলের কোটী কোটী ভূত পলাইয়াছে, তখন একটী ভূত কি পালাবে না? তৎপরে পাঁচকড়ি মহা আনন্দে জমিদারকে জানাইল, আমি ভূতের রোজা—আমি গানে ভূত ছাড়াইতে পারি। পাঁচকড়িকে জমিদার মহাশয় আপনার স্ত্রীর সম্মুখে লইয়া যাইবামাত্র, সেই ভূতটা চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওঁরে আঁবাঁর পেঁচোঁ এঁসেঁছেঁ, ওঁর গাঁনেঁর জ্বাঁলাঁয় জঁঙ্গল ছেঁড়েঁ এঁই মাগিঁটাকেঁ আঁশ্রয় কঁরেছিলাঁম—এঁখানেও পেঁচোঁ এঁলো তঁবেঁ পাঁলাই পাঁলাই।' বলিতে বলিতে ভূতটা বাটীর সম্মুখের আম গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। জমিদারের স্ত্রী আরাম হইল। পাঁচকড়ি ২০০০৲ টাকা পুরস্কার পাইল।

উপদেশ—এক বিষয়ে লাগিয়া থাকিলে, সুফল এক সময়ে পাওয়া যায়।

রঙ্গরস।

(১)

সৃষ্টি দুই প্রকারের—ঈশ্বরের ও বিশ্বামিত্রের। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে ডাঙ্গায় জল এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে গাছে জল, (নারিকেল)। পাঠক! যাঁহারা ঈশ্বরবাদী তাঁহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি—আর যাঁহারা নাস্তিক তাঁহারা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। যাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি তাঁহারা ঈশ্বরকে না মানিয়া থাকিতে পারেন না; আর যাঁহারা তাহা নহেন, তাঁহারা কি প্রকারে মানিবেন? অতএব নাস্তিকদিগকে আস্তিকদিগের গালাগালি দেওয়াটা ভাল নহে।

(২)

পিতৃভক্তির বিরুদ্ধে কোন বৈজ্ঞানিক এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন। পিতৃ-রক্ত-কণিকা মানুষের দেহে কয়েক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকে, তারপর আদতে থাকে না, অতএব কয়েক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান পিতার নিকট ঋণী, তারপর সে প্রকৃতপক্ষে ঋণী নহে। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত দলের মধ্যে পিতৃভক্তির অভাব দেখিয়া যদি কেহ দুঃখ করেন তো, তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্তই মূর্খ। সাহেবরা ঠিক্ পথেই আছে।

(৩)

বিধবা কল্পনাকুমারী, ২৫ বৎসরের বি-এ পাশ করা ছেলে কোলে করিয়া, জনষ্টুয়ার্ট মিলের স্বাধীনতার মন্ত্র আওড়াইয়া,

বিলাত ফেরত মিঃ বান্নুর্জিকে বিবাহ করিয়া, সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কারণ পতিভক্তি থাকিলেই পতির প্রয়োজন। বিনা পতিভক্তিতে কেহ সতী হইতে পারে না। যাহার জন্য ভক্তি, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভক্তিটাও যাইতো, তো, নবীনা বিধবা সে ভক্তির ভাবে অভিভূতা না হইয়া, বেশ গাঝাড়া দিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু পতি বিহনে সেই পতিভক্তিটা আশ্রয় পাইবার জন্য বিধবাকে এমনি তাড়না করিতে লাগিল যে, সতী পতির জন্য বড় ব্যাকুলা হইল; অবশেষে পতিভক্তি রাখিবার স্থান ত্রিসংসারে খুঁজিয়া মিলিল না বলিয়া, মিঃ বান্নুর্জির রূপরাশিতে তাহা মিশাইয়া দিয়া, পতিভক্তিটাকে জীবন্ত রাখিবার উপায় লাভে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিল। এইরূপ বিবাহ আর দুই একটী হইলে, ভারতের মুক্তিলাভ ঘটিবে—যেখানকার ভারত সেইখানেই লীন হইবেক। হিমালয় পূর্ব্বস্থান সমুদ্রতলে বসিবেন ইত্যাদি। সংস্কারকগণ! ভারতের মুক্তিটা তোমাদের দ্বারাই হবে!

(৪)

ইউনিভারসিটীর পাঠ্য পুস্তকগুলিকে ভস্ম করিয়া বিদ্যুৎ মিশাইয়া এমনি এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, তাহা খাইয়া পরীক্ষা দিলে (পুস্তক পড়া না থাকিলেও) নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। একজন Key maker অর্থ পুস্তক প্রণেতা, এ বৎসরে এণ্ট্রান্স, এল-এ, বি-এ, কোর্সের অর্থ পুস্তক না লিখিয়া এইরূপ বটিকা প্রস্তুত

করিয়াছেন। এই বটিকার নাম 'কোর্সভস্ম বটিকা'। ছাত্রগণ এই বটিকা অনুসন্ধান করিতে কালবিলম্ব করিবেন না। ইহাতে সুবিধা এই, এ, বি, না শিখিয়া বি, এ পাশ করা যাইবেক। আমাদের দেশের Key maker দিগের দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়। তাঁহাদের দ্বারা আর কিছু উপকার না হউক, পাশ্চাত্য সাম্য মন্ত্রের জয় সাধনা হইতেছে। মূর্খে ও বিদ্বানে ক্রমশঃ একাকার হইবার সময় তাঁহারা প্রায় উপস্থিত করিতেছেন। হাড়ি, মুচি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তো সমান হইতেছে—বিদ্বান্ মূর্খও সমান হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা! তুমি কিছুকাল মধ্যে ভারতবর্ষকে একাকার করিবে।

(৫)

একজন ব্রাহ্মণ পথ হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া কোন পল্লীতে এক শূদ্রের বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শূদ্র ব্রাহ্মণের পা ধুইবার জন্য একটী ঘটী জল আনিয়া দিল। ঘটিটী পিতলের—রাং দিয়া ঝালান। ব্রাহ্মণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, ঘটিটীর প্রায় সর্ব্বস্থলই রাং দিয়া মেরামৎ করা। ব্রাহ্মণ কৌতুক করিয়া শূদ্রকে জিজ্ঞাসিলেন। হাঁহে! এটী তোমার পিতলের ঘটী রাং দিয়া ঝালান, কি রাংএর ঘটী পিতল দিয়া ঝালান?

(৬)

কোন কলেজ-স্কুলে একটী কৃষ্ণকায় পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতটী অত্যন্ত কাল। সেই কাল রংটার জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে মাঝে মাঝে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইত। এণ্ট্রান্স ক্লাশে

বাঙ্গালা পড়াইতেন। ছাত্রগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে জ্বালাতন করিত। ছাত্রগণ তাঁহাকে স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য বিধি-মতে চেষ্টা করিত—কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের সুপারিসের জোর থাকায় পণ্ডিত মহাশয় অটল হইয়া থাকিলেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে, পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিবার পূর্ব্বে, ছাত্রগণ একটী সাপ লইয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের বসিবার চেয়ারের সম্মুখস্থ বইএর ডেস্কে—রাখিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে প্রবেশ করিবামাত্র, একটা মুখচাপা হাসির মৃদু মৃদু শব্দ উঠিল। তারপর দুই তিন স্থলে কৃত্রিম কাসি ও হাঁচির উৎপাত আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিবামাত্র—ছাত্রদিগের সেই অস্ফুট কোলাহল পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দুই একটি ভাল ছেলে এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল—এখন হাসির তোড়ে আক্রান্ত হইয়া আর থাকিতে পারিল না। ভয়ানক হাসি হাড় মাস ভেদ করিয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহারা মুখ হেঁট করিয়া মুখের ভিতরে চাদর পুরিতে লাগিল। তারপর যখন পণ্ডিত মহাশয় ডেস্ক খুলিবার জন্য হাতখানি বাড়াইলেন, অমনি সেই ব্যাপারের কর্ম্মকর্ত্তা ৩৪টী ছাত্র মুখ চাদরে চাপিয়া পেটের হাসিটাকে ভিতরে চাপিতে চাপিতে ক্লাশের বাহিরে চলিয়া যাইল—সমুদয় ক্লাশে একটা ভীষণ হাসির রোল উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় ডেস্ক খুলিবামাত্র সাপটা কিল্‌বিল্‌ করিয়া উঠায়, পণ্ডিত মহাশয় "বাবারে" বলিয়া তড়াং করিয়া লাফাইয়া সে স্থান ছাড়িলেন। অমনি সমুদয় গৃহ ছাত্রগণের হাসির উচ্চ কোলাহলে যেন ফাটিবার উপক্রম হইল।

পণ্ডিত মহাশয় রাগে ফুলিতে ফুলিতে তেলে বেগুণে জ্বলার

মুত, উন্মত্তের ন্যায় অপমান ও জিঘাংসার আক্রমণে অধীর হইয়া কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট নালিশ করিবার জন্য মহাবেগে যাত্রা করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশ ছাড়িয়া গেলে, ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মঘট বসিল। তখন সকলেই এক মতাবলম্বী হইয়া মিথ্যার জয়লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সেই ব্যাপারের মহারথীগণ, সমুদয় ক্লাশে চুপে চুপে যাইয়া যেন বৈদ্যুতিক বলে স্কুলের সমুদয় ছাত্রকে এক-মতাবলম্বী করিয়া ফেলিল। কে একজন বুদ্ধিমান ছাত্র, চাণক্যের বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, সকলকে শিখাইয়া দিল যে, সাহেব কৈফিয়াৎ চাহিলে আমরা বলিব, "পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রীষ্মকালে বায়ুরোগ বাড়ে—সেই বায়ুরোগের জন্য তিনি বিকৃত মস্তিষ্কে সকল স্থলেই সর্প দর্শন করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সাপ—সাপ একটা বাই আছে।" তার পর কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব, পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে ছাত্রদিগের দুর্ব্বব্যহারের ভীষণ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ক্লাশে আসিলেন। তখন ছাত্রগণ বড়ই শিষ্ট শান্তভাবে বই খুলিয়া পড়িতেছে—ক্লাশে যে একটা অতবড় ব্যাপার হইয়াছে, তাহা যেন তাহারা অবগতই নহে। সাহেব আসিয়া ক্রোধের সহিত কৈফিয়াৎ চাহিল। ছাত্রগণ সমস্বরে বলিল, ক্লাশে সাপ কেহ দেখে নাই, পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রীষ্মকালে মাথার ব্যারাম বাড়ায়, উনি চারিদিকে সাপ দেখিয়া থাকেন। যখন স্কুলের সকল ছাত্র ঐ কথা বলিল, তখন সাহেব নিরস্ত হইয়া ফিরিলেন। পণ্ডিত মহাশয় পৃথিবীতে মিশিবার উপায় না থাকায়, পেটের দায়ে আবার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৭)

গভীর শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় রঙ্গরস প্রিয় লোক ছিলেন। এক সময়ে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। সেখানে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে, অনেক বড় লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি দুই খানি ইংরাজি পত্র আনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে দিলেন। পত্র দুখানি হাতে দিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, মহাশয় আপনি তো কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন মহারথী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ভাল ইংরাজী শিখে না কেন? দেখুন, একজন এম্-এ এই পত্রখানি লিখিয়াছেন, ইহাতে কত ইংরাজীর ভুল, আর অন্য পত্রখানি একজন এন্ট্রান্স না-পাশ করা ছেলের লেখা। তার চিঠিখানা তো নির্ভুল দেখিতেছেন। এ বিষয়ের একটী ভাল জবাব আপনাকে দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন। বাপু! তোমায় একটী গল্প বলি শুন। গল্পটায় তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইবেক। বিদ্যাসাগর মহাশয় আরম্ভ করিলেন:—একটী গুলির আড্ডায় নানা ভাবের কথা চলিতেছিল। একজন পরিশেষে বলিল, আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলি শুন। সে বলিল:—আমি এমন একটী কল দেখিয়াছি, তাহাতে আক ও বাছুর বাঁধিয়া ফেলিয়া দিতেছে; আর সেই কলের বাহিরে নানা প্রকারের সন্দেশ বাহির হইতেছে। কলের ভিতরে বাছুর বাড়িয়া দুগ্ধ দান করিতেছে। কলের ভিতরে আক হইতে গুড় হইয়া চিনি প্রস্তুত হইতেছে। পরিশেষে ছানা ও চিনিতে

মিশিয়া নানা প্রকারের সন্দেশ বাহির হইতেছে। সন্দেশ নানা প্রকারের হইলেও আস্বাদনে সবই এক প্রকার। সেইরূপ আমরাও ইউনিভারসিটীরূপ কলে ছাত্র শিক্ষক, টেবিল চেয়ার কেতাব কলমাদি ফেলিয়া দিতেছি, আর নানা প্রকারের উপাধি বিশিষ্ট ছাত্র বাহির হইতেছে ; যথা এণ্ট্রান্স, এল এ, বিএ, এম এ প্রভৃতি। আস্বাদন করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সন্দেশের মত সকলের গুণ সমান।" কথাটী শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। মনে মনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, সদুত্তর পাইয়া, ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

(৮)

এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনার স্কুলে একি প্রকার ব্যবস্থা? এ, বি, যে পড়ে তার মাহিনা ৩৲ আবার বি-এ যে পড়ে তার মাহিনাও ৩৲, হয় এক দিকে কমান—না হয় আর এক দিকে বাড়ান। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বলিয়া উত্তর দিলেন "আমার ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। কারণ এক দিকে এ, বি ও অন্য দিকে বি, এ। হরপের উল্টা মাত্র। বিদ্যা উভয় পক্ষেরই সমান।

(৯)

চুম্বন জিনিসটী কি? এই সম্বন্ধে কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনেক গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, ইহা রাক্ষসত্বের অবশিষ্টাংশ (Remnant o Canibalism)। পূর্ব্বে মানুষে

মানুষ খাইত। এখন মানুষ সভ্য হইলেও সে অভ্যাসটা ছাড়িতে না পারায়, মানুষ মানুষের মুখ-চুম্বন করে। কথাটা আমাদের ঠিক বলিয়াই বোধ হয়।

(১০)

চুম্বন জিনিসটী কি? এটী নিরাকার পদার্থ। যদি সাকার হইত, তো মোণ্ডা মিঠাই অপেক্ষা ইহার দাম অধিক হইত। তাহা হইলে প্রণয়িণীদিগকে চুম্বন লাভের পর আঁচাইতে হইত। নিরাকার হইয়াই জগতে এত আধিপত্য সাকার হইলে, না জানি, সে আধিপত্যটী কতদূর বাড়িত। উহার উপাদান কি কেহ বলিতে পারেন?

জিনিসটী যাহাই হউক না কেন, উহা যে সভ্যতার পরিচায়ক তাহার আর সন্দেহ নাই—সভ্যতার উন্নতির সহিত উহারও উন্নতি।

সম্পূর্ণ।